চতুর্থ অধ্যায়

অণুজীব

MICRO-ORGANISM / MICROBE

প্রধান শব্দসমূহ : ভাইরাস, T_2 ফায, ব্যাকটেরিয়া, কক্কাস, দ্বি-ভাজন, মেরোজাইগোট

যেসব জীব খুবই ক্ষুদ্রাকায় এবং অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায় না তাদেরকে **অণুজীব** (Microbes) বলা হয়। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, সে শাখাকে **অণুজীবতত্ত্ব** বা **মাইক্রোবায়োলজি** (Microbiology) বলা হয়। ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত। অণুজীববিদগণ ভাইরাসকেও অণুজীব বলতে চান। অণুজীবের বিস্তারই হলো ট্রান্সমিশন। মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছো। এ অধ্যায়ে তোমরা অতি-আণুবীক্ষণিক ভাইরাস এবং আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—

- ❖ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব।
- ❖ ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবন চক্র।
- ❖ ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়।
- ❖ কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত।
- ❖ ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন (চিত্রসহ)।
- ❖ ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ।
- ❖ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়।
  ব্যবহারিক : ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন।
- ❖ *Plasmodium vivax* (ম্যালেরিয়ার পরজীবী) এর জীবন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা।
- ❖ মানবদেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর সংক্রমণ ও প্রতিকার।

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	ভাইরাস : বৈশিষ্ট্য ও গঠন
পাঠ ২	কোষের সূক্ষ্ম গঠন : TMV ও ব্যাক্টেরিওফায (T_2-ফায)
পাঠ ৩	ভাইরাসের গুরুত্ব
পাঠ ৪ ও ৫	ভাইরাসজনিত রোগ : হেপাটাইটিস ও ডেঙ্গু জ্বর
পাঠ ৬	ভাইরাসজনিত রোগ : পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ
পাঠ ৭ ও ৮	ব্যাক্টেরিয়ার আবাস, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিন্যাস ও গঠন
পাঠ ৯	ব্যাক্টেরিয়ার জনন
পাঠ ১০	ব্যাক্টেরিয়ার গুরুত্ব
পাঠ ১১	ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ : ধানের ব্লাইট রোগ
পাঠ ১২	ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ : কলেরা
পাঠ ১৩	ব্যবহারিক : ব্যাক্টেরিয়া পর্যবেক্ষণ (নমুনা : টক দই)
পাঠ ১৪	ম্যালেরিয়ার পরজীবী : মানবদেহে জীবনচক্র
পাঠ ১৫	মশকীর দেহে জীবনচক্র

MENINGES
Academic And Admission Care

৪.১ : ভাইরাস (Virus)

সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জলাতঙ্ক, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বার্ড ফ্লু, ভাইরাল হেপাটাইটিস, কোভিড-১৯ ইত্যাদি রোগের কথা প্রায়ই শুনে থাকি; কখনো নিজেরাই আক্রান্ত হই। এগুলো সবই ভাইরাসজনিত রোগ অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা এ রোগগুলো হয়ে থাকে। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুর (গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, ইঁদুর, মুরগি), এমনকি গাছপালারও ভাইরাসঘটিত রোগ হয়।

ভাইরাস কী? ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী বস্তু। ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হলো **বিষ**। ভাইরাস আকারে এতোই ছোটো যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়, সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না। তাই ভাইরাসকে বলা হয় **অতি-আণুবীক্ষণিক** (ultra-microscopic); অর্থাৎ ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু। বিজারিঙ্ক প্রথম ভাইরাস নামটি প্রবর্তন করেন। ভাইরাসের দেহ বাইরের প্রোটিন আবরণ এবং অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) এ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। কাজেই **ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু।** ভাইরাস জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় অংশ) ও প্রোটিন (আবরণ) দিয়ে গঠিত অকোষীয়, অতি-আণুবীক্ষণিক, বাধ্যতামূলক পরজীবী বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় (জড় বস্তুর মতো) বিরাজ করে।

ভাইরাসকে জীবাণু (বা অণুজীব) না বলে 'বস্তু' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো কেন? কারণ, আমরা জানি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত, কিন্তু ভাইরাস অকোষীয়। তাছাড়া এরা জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারলেও জীবদেহের বাইরে

CamScanner

একেবারেই নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে। সত্যিকার অর্থে এরা অণুজীব নয়, অণুজীবের মতো। ভাইরাস অকোষীয়। কারণ ভাইরাসে কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম এবং কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম ইত্যাদি অনুপস্থিত। ভাইরাস শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন নিয়ে গঠিত। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ভাইরাসকে **অকোষীয়** বলা হয়।

আবিষ্কার : গুটিবসন্ত, পীত জ্বর ইত্যাদি ভাইরাসঘটিত রোগ পৃথিবীতে বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু ভাইরাস সম্বন্ধে কোনো ধারণাই মানুষের ছিল না। বিজ্ঞানী Edward Jenner (এডওয়ার্ড জেনার) ১৭৯৬ সালে প্রথম ভাইরাসঘটিত বসন্ত রোগের কথা উল্লেখ করেন। **সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ ভাইরাস হলো টোবাকো মোজাইক ভাইরাস অর্থাৎ TMV.** হল্যান্ডের বিজ্ঞানী **Adolf Mayer** ১৮৮৬ সালে তামাক গাছের পাতার ছোপ ছোপ দাগবিশিষ্ট রোগকে টোবাকো মোজাইক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে ১৮৯২ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী **Dmitri Ivanovsky** (দিমিত্রি আইভানোভসকি) প্রমাণ করেন যে, রোগাক্রান্ত তামাক পাতার রস ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টার দিয়ে ফিল্টার করার পরও সুস্থ তামাক গাছে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই তিনি বলেন যে, তামাক গাছের মোজাইক রোগজীবাণু ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষুদ্র এবং এ রোগ-বিষকে ভাইরাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন কিন্তু কোনো ভাইরাস শনাক্ত করতে পারেননি। **তবুও তাঁকেই ভাইরাসের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।** তারও পরে ১৮৯৮ সালে আরেক হল্যান্ড বিজ্ঞানী **Martinus Beijerinck** (মার্টিনাস বিজারিঙ্ক) তামাকের মোজাইক রোগের ভাইরাসকে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV হিসেবে উল্লেখ করেন। **Walter Reed** (ওয়াল্টার রিড) ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম মানবদেহের পীত জ্বর (yellow fever) সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **Wendel Meredith Stanley** TMV কে পৃথক করে কেলাসিত করেন, যে কারণে তিনি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। Stanley মোজাইক আক্রান্ত ১ টন তামাক পাতা থেকে মাত্র এক চামচ পরিমাণ ভাইরাস ক্রিস্টাল সংগ্রহ করেন। ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের দুজন বিজ্ঞানী **F. C. Bawden** (ব্যাডেন) এবং **N. W. Pirie** (পিরি) বলেন যে, TMV নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ১৯৫১ সালে **R. S. Shafferman** (শেফারম্যান) এবং **M. E. Morris** (মরিস) নীলাভ-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ধ্বংসকারী ভাইরাস সায়ানোফায আবিষ্কার করেন। ভাইরাস জড় না জীব এর সঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। কারণ ভাইরাসের দেহে জড় ও জীব উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভাইরাসের দেহে জড় ও জীবের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী **A. M. Lwoff ১৯৫২ সালে ভাইরাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন, ভাইরাস ভাইরাসই। এটি জীবীয় বস্তুও নয়, আবার জড় রাসায়নিক বস্তুও নয়। জীবীয় ও জড় বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি কিছু।** ১৯৮৪ সালে Gallow (গ্যালো) মানুষের মরণব্যাধি এইডস রোগের ভাইরাস HIV আবিষ্কার করেন। ১৯৮৯ সালে **Hervey J. Alter** (হারভে জে. অল্টার) মানুষের নীরব ঘাতকব্যাধি হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। **F. C. Bawden এবং N. W. Pirie ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন।** ২০১৯ সালের শেষ দিকে নভেল করোনা ভাইরাস আবিষ্কার হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ ধরনের ভাইরাসের বর্ণনা করা হয়েছে।

আবাসস্থল : উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি প্রায় সব জড় মাধ্যমে ভাইরাস অবস্থান করে। কাজেই বলা যায়, জীব ও জড় পরিবেশ উভয়ই ভাইরাসের আবাস। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ১ চামচ সমুদ্রের পানিতে ১ মিলিয়ন ভাইরাস থাকে। জীববিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ভাইরোলজি (Virology)। এ শাখায় ভাইরাসের আকার, গঠন, বংশবিস্তার, রোগতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। **W. M. Stanley-কে ভাইরোলজির জনক বলা হয়ে থাকে।**

আয়তন (Size) : ভাইরাস অতি-আণুবীক্ষণিক এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া এদেরকে দেখা যায় না। ভাইরাসের গড় ব্যাস 8–300 nm (ন্যানোমিটার)। ভাইরাস সাধারণত ১২ nm (যেমন- পোলিও ভাইরাস) হতে ৩০০ nm (যেমন- তামাকের মোজাইক ভাইরাস) পর্যন্ত হয়ে থাকে। গবাদি পশুর ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র (৮-১২ nm)। ভ্যাকসিনিয়া ও ভেরিওলা ভাইরাস (২৮০–৩০০ nm)। গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস, গো-বসন্তের ভাইরাস আরও বৃহদাকৃতির হয়।

আকৃতি (Shape) : ভাইরাস সাধারণত নিম্নলিখিত আকৃতির হয়ে থাকে। দণ্ডাকার, বর্তুলাকার, ব্যাঙাচি আকার, সূত্রাকার (সিলিন্ড্রিক্যাল), গোলাকার, ডিম্বাকার, পাউরুটি আকার, বহুভুজাকৃতি প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট।

১ মিটার (m)	= ১০০০ মিলিমিটার (mm)	১ মাইক্রোমিটার (μm)	= ১ মাইক্রন (μ)
১ মিলিমিটার (mm)	= ১০০০ মাইক্রোমিটার (μm) বা মাইক্রন	১ ন্যানোমিটার (nm)	= ১ মিলিমাইক্রন (mμ)
১ মাইক্রোমিটার (μm)	= ১০০০ ন্যানোমিটার (nm) বা মিলিমাইক্রন (mμ)		

MENINGES Academic And Admission Care
CS CamScanner

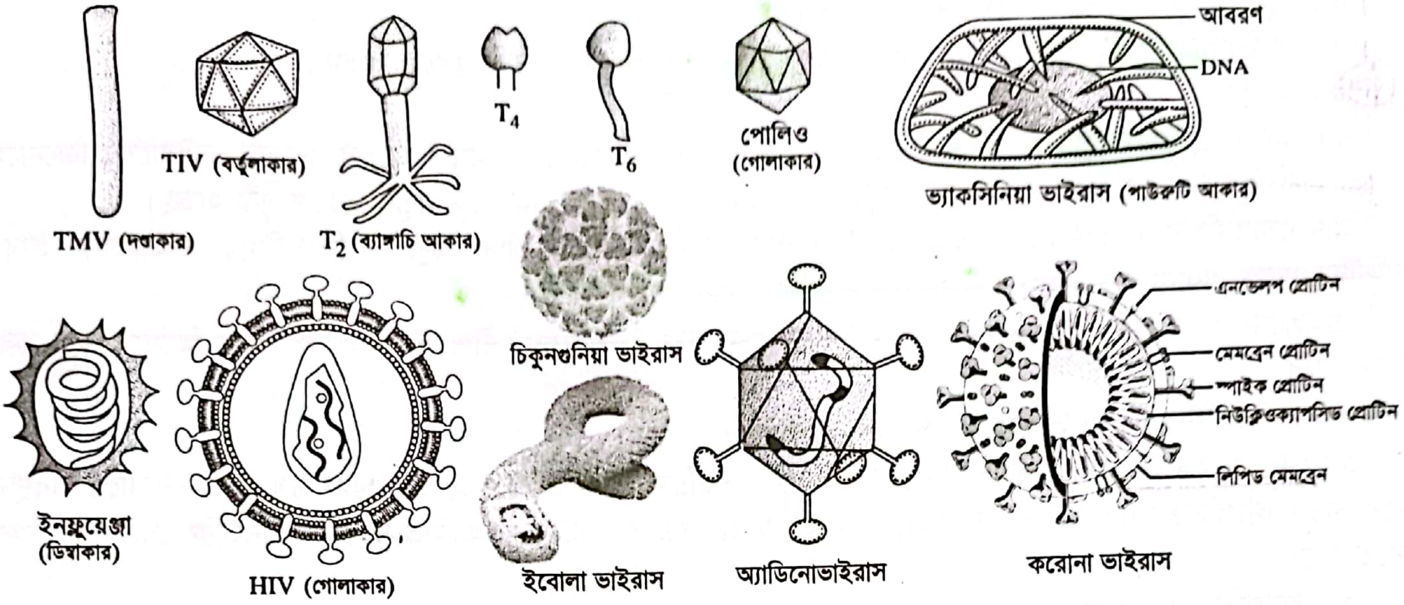

চিত্র ৪.১ : বিভিন্ন আকৃতির ভাইরাস।

ভাইরাসের প্রকৃতি (Nature of virus) : ভাইরাসের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো দ্বিধাবিভক্ত। বিজ্ঞানী Lwoff ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মন্তব্য করেন- **ভাইরাস জীবও নয়, জড়বস্তুও নয়; ভাইরাস ভাইরাসই।** নিরপেক্ষভাবে বলা যায়- ভাইরাস সজীব ও জড়বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি বস্তু। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী Stanley ও Valens বলেন- ভাইরাস এমনিতেই জড়বস্তুর ন্যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ভাইরাস কোনো সজীব কোষকে আক্রমণ করার সুযোগ পায় সে মুহূর্তে এতে **প্রাণের সঞ্চার হয়।** ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী Salle বলেন–**ভাইরাস রাসায়নিক অণু ও সজীব কোষের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক প্রকার বস্তু।**

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of virus) : ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

(ক) জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) জীবীয় বৈশিষ্ট্য।

MENINGES
Academic And Admission Care

(ক) ভাইরাসের জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

১। ভাইরাস অকোষীয় ও অতি আণুবীক্ষণিক। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লি, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এসব নেই।
২। এদের নিজস্ব কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই এবং খাদ্য গ্রহণ করে না, ফলে পুষ্টি ক্রিয়াও নেই।
৩। ভাইরাস জীবকোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।
৪। ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টারে ভাইরাস ফিল্টারযোগ্য নয়।
৫। ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায়, তলানিকরণ করা যায়।
৬। জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার মতো নিষ্ক্রিয়।
৭। ভাইরাসের দৈহিক বৃদ্ধি নেই এবং পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না।
৮। ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমাহার মাত্র।
৯। ভাইরাস অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ প্রতিরোধে সক্ষম এবং **আন্টিবায়োটিক এদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।**

(খ) ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য

১। পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি (multiplication) করতে পারে।
২। নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মাতৃ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে।
৩। ভাইরাসের দেহ জেনেটিক বস্তু DNA অথবা RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

CS CamScanner

৪। ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।
৫। ভাইরাস পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে এবং প্রকরণ (variation) তৈরি করতে সক্ষম।
৬। এদের অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।
৭। এদের জিনগত পুনর্বিন্যাস (genetic recombination) ঘটতে দেখা যায়। নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোমে ডিলিশন ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যা এর সংক্রমণ ক্ষমতা হ্রাস করে। এর নতুন নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রাণ-রসায়নবিদগণ ভাইরাসের জড়-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন, আর অণুজীব বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসের জীব-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। এজন্য ভাইরাসকে জীব ও জড়ের সেতুবন্ধন বলে।

ভাইরাসের গঠন (Structure of virus) : ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্যকে ভৌত ও রাসায়নিক গঠন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে।

ভাইরাসের ভৌত গঠন : ভাইরাসের ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

১। কেন্দ্রীয় বস্তু : কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বস্তু হলো **নিউক্লিক অ্যাসিড** (DNA ও RNA সাধারণত একসাথে অবস্থান করে না)। ক্যাপসিড দ্বারা পরিবেষ্টিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিক অ্যাসিড বা নিউক্লিক অ্যাসিড অঞ্চলকে **নিউক্লিওয়েড** তুল্য বলা যেতে পারে।

২। ক্যাপসিড : কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থিত **ক্যাপসিড** তথা প্রোটিন আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণুর বিন্যাসই ভাইরাসের আকার-আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন অণু সজ্জিত হয়ে দণ্ডাকৃতির হেলিক্স এবং গোলাকৃতির পলিহেড্রন কাঠামো গঠন করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাবইউনিট নিয়ে গঠিত। সাবইউনিটকে বলা হয় **ক্যাপসোমিয়ার** (capsomere)। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও ধরন বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্যাপসিডের বহিঃস্থ আবরণ মসৃণ বা কন্টকিত হতে পারে। কন্টকগুলোকে **স্পাইক** বলে।

৩। এনভেলপ : কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে সাধারণত 10–15 μm পুরু অপর একটি আবরণ থাকে যা এনভেলপ হিসেবে পরিচিত।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু দিয়ে গঠিত; যথা : নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং ক্যাপসিড (প্রোটিন)।

১। নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) : ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। নির্দিষ্ট ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA এর যেকোনো এক ধরনের হয়। কখনো একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে না। অন্যান্য জীবদেহে একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে। সাধারণত অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA এবং অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাসে DNA থাকে। তবে এটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উদ্ভিদ ভাইরাস হওয়া সত্ত্বেও ফুলকপির মোজাইক ভাইরাসে DNA থাকে।

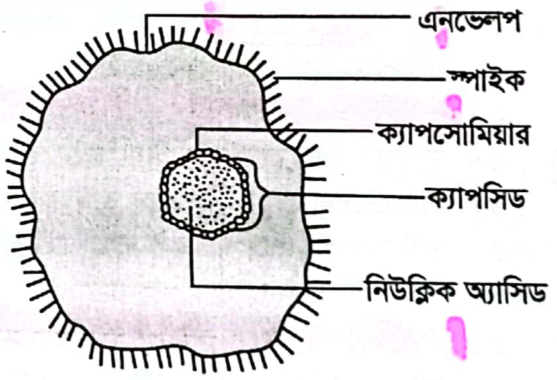

চিত্র ৪.২ : ভাইরাসের অন্তর্গঠন

২। ক্যাপসিড (প্রোটিন) : প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষকদেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে। ক্ষেত্রবিশেষে ক্যাপসিডে প্রোটিনের সাথে লিপিড ও স্টার্চ থাকে। ক্যাপসিড ভেতরের বস্তুকে (DNA বা RNA) সুরক্ষা করে এবং এটি অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে। সর্দিজ্বরে এটি হাঁচির উদ্রেক করে।

৩। বহিঃস্থ আবরণ : কোনো কোনো ভাইরাসে (যেমন-ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, HIV, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি) ক্যাপসিডের বাইরে জৈব পদার্থের একটি আবরণ থাকে। এটি রাসায়নিকভাবে সাধারণত লিপিড, লিপোপ্রোটিন, শর্করা বা স্নেহজাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। **লিপিড বা লিপোপ্রোটিন স্তরের একককে পেপলোমিয়ার বলা হয়। লিপোপ্রোটিন আবরণবিশিষ্ট ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলা হয়।** এনভেলপবিহীন ভাইরাসকে নগ্ন ভাইরাস বলা হয়।

৪। এনজাইম : ভাইরাসের দেহে সর্বদা এনজাইম থাকে না। ব্যতিক্রম—ব্যাক্টেরিওফায ভাইরাসে লাইসোজাইম এনজাইম থাকে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে নিউরামিনিডেজ এনজাইম থাকে এবং HIV ভাইরাসে রিভার্জ ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইম থাকে।

CS CamScanner

ভাইরাসের প্রকারভেদ : গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। আকৃতি অনুযায়ী : আকৃতি অনুযায়ী ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা :

(i) **দণ্ডাকার (Rod-shaped) :** এদের আকার অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ– টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস।

(ii) **গোলাকার (Spherical) :** এদের আকার অনেকটা গোলাকার। উদাহরণ– পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

(iii) **ঘনক্ষেত্রাকার/বহুভুজাকার (Cubical/Polygonal) :** এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন– হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস।

(iv) **ব্যাঙাচি আকার (Tadpole shaped) :** এরা মাথা ও লেজ– এ দু অংশে বিভক্ত। উদাহরণ– T_2, T_4, T_6 ভাইরাস।

(v) **সিলিন্ড্রিক্যাল/সূত্রাকার (Cylindrical/Thread shaped) :** এদের আকার লম্বা সিলিন্ডারের মতো। যেমন– Ebola virus ও মটরের স্ট্রিক ভাইরাস।

(vi) **ডিম্বাকার (Oval shaped) :** এরা অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ– ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

২। নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী : নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী ভাইরাস দু' প্রকার; যথা : (i) DNA ভাইরাস এবং (ii) RNA ভাইরাস।

(i) **DNA ভাইরাস :** যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA থাকে তাদেরকে **DNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ– T_2 ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridiscent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস। Parvoviridae গোত্রের (ϕX_{174} ও M_{13} কলিফায) **ভাইরাসের DNA একসূত্রক।**

(ii) **RNA ভাইরাস :** যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে RNA থাকে তাদেরকে **RNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ– TMV, HIV, ডেঙ্গু, পোলিও, মাম্পস, র‍্যাবিস, নভেল করোনা ইত্যাদি ভাইরাস। **Reoviridae গোত্রের** (রিও ভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস) **ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।**

MENINGES
Academic And Admission Care

৩। বহিঃস্থ আবরণ অনুযায়ী ভাইরাস দু প্রকার; যথা : (i) বহিঃস্থ আবরণহীন ভাইরাস; যেমন– TMV, T_2 ভাইরাস; (ii) বহিঃস্থ আবরণীযুক্ত ভাইরাস; যেমন– ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস, HIV ভাইরাস।

৪। পোষকদেহ অনুসারে ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে :

(i) **উদ্ভিদ ভাইরাস :** উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে **উদ্ভিদ ভাইরাস** বলে। যেমন– TMV, Bean Yellow Virus (BYV)।

(ii) **প্রাণী ভাইরাস :** প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে **প্রাণী ভাইরাস** বলে। যেমন– HIV, ভ্যাক্সিনিয়া, নভেল করোনা ভাইরাস।

(iii) **ব্যাকটেরিওফায বা ফায ভাইরাস :** ভাইরাস যখন ব্যাক্টেরিয়ার ওপর পরজীবী হয় এবং ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে তখন তাকে ব্যাকটেরিওফায বলে। যেমন– T_2, T_4, T_6 ব্যাকটেরিওফায।

(iv) **সায়ানোফায :** সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ধ্বংসকারী ভাইরাসকে **সায়ানোফায** বলে। যেমন– LPP_1, LPP_2 (*Lyngbya*, *Plectonema* ও *Phormidium* নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার প্রথম অক্ষর দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে।)

৫। পোষক দেহে কীভাবে সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি করে তার ওপর ভিত্তি করেও ভাগ করা হয়। যেমন– সাধারণ ভাইরাস ও রিট্রোভাইরাস। HIV একটি রিট্রোভাইরাস। এখানে ভাইরাল RNA থেকে DNA তৈরি হয়।

৬। অন্যান্য ধরন : যেসব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে থাকে তাদের **মাইকোফায** (Mycophage) বলে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে Holmes ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phaginae, উদ্ভিদ আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phytophaginae এবং প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাসকে Zoophaginae নামকরণ করেন।

RNA ভাইরাস ও DNA ভাইরাস এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	RNA ভাইরাস	DNA ভাইরাস
১। আকৃতি	এরা সাধারণত দণ্ডাকার বা সূত্রাকার।	এরা সাধারণত গোলাকার, ব্যাঙ্গাচি আকার ও পাউরুটি আকৃতি।
২। নিউক্লিক অ্যাসিড	এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর RNA.	এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর DNA.
৩। আক্রান্ত জীব	অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাস ও সায়ানোফাযগুলো RNA ভাইরাস। ফুলকপি মোজাইক ভাইরাস DNA ভাইরাস।	অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিও-ফাযগুলো DNA ভাইরাস।
৪। সূত্রক	অধিকাংশ ভাইরাসের RNA একসূত্রক; ধানের বামন রোগ ও রিওভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।	অধিকাংশ ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক; ϕX_{174} ও M_{13} কলিফায ভাইরাসের DNA একসূত্রক।
৫। রোগ সৃষ্টি	সাধারণত উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে।	সাধারণত প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে।
৬। এনভেলপ	সাধারণত এনভেলপ থাকে না।	ক্যাপসিডের বাইরে সাধারণত এনভেলপ থাকে।
৭। উদাহরণ	TMV, শ্যুগারকেন মোজাইক, টারনিপ মোজাইক, আলফা-আলফা মোজাইক, রেবিস, মানুষের পোলিও, ডেঙ্গু, পীত জ্বর, মাম্পস, মিজ্‌লস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-B, এনসেফালারটিস, COVID-19 ইত্যাদি ভাইরাস।	T_2 ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridescent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস DNA ভাইরাস।

* নিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA অথবা DNA) পার্থক্যই একমাত্র সঠিক পার্থক্য। অন্যগুলো সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

ভাইরাসের পরজীবিতা (Parasitism of virus) : পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকার চরিত্রকে পরজীবিতা বলে। ভাইরাস বাধ্যতামূলক পরজীবী (obligate parasite)। এটি একটি আদি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ভাইরাস তার বংশবৃদ্ধি তথা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যজীবের সজীব কোষের ওপর নির্ভরশীল। অন্য কোনো জীবের (মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি) সজীব কোষ ছাড়া কোনো ভাইরাসই জীবের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে না, বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কোনো আবাদ মাধ্যমে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করা বিজ্ঞানীদের পক্ষেও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

ভাইরাসের পরজীবিতা সাধারণত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রকারের ভাইরাস কোনো সুনির্দিষ্ট জীবদেহে পরজীবী হয়। যে সব ভাইরাস আদিকোষকে আক্রমণ করে, আর যেসব ভাইরাস প্রকৃতকোষকে আক্রমণ করে তারা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাইরাসের প্রোটিন আবরণটিই নির্ণয় করে তার আক্রমণের সুনির্দিষ্টতা (specificity)। পোষক কোষে কোনো ভাইরাস- প্রোটিনের জন্য রিসেপ্টর সাইট (receptor site) থাকলে তবেই ঐ ভাইরাস ঐ পোষক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে। এ জন্যই ঠাণ্ডা লাগার ভাইরাস (cold virus) শ্বাসতন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেন কোষকে আক্রমণ করতে পারে, চিকেন পক্স ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারে, পোলিও ভাইরাস ঊর্ধ্বতন শ্বাসনালি ও অন্ত্রের আবরণকোষ, কখনো স্নায়ু-কোষকে আক্রমণ করতে পারে। চিকেন পক্স ভাইরাস শ্বাসনালিকে আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ শ্বাসনালি কোষে এর জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই, ঠাণ্ডা লাগার ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ ত্বক কোষে এ ভাইরাসের জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই।

ফায ভাইরাস কেবল ব্যাকটেরিয়া কোষকেই আক্রমণ করে। ফায ভাইরাসের মধ্যে T_2-ব্যাকটেরিওফায *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রমণ করে। TMV ভাইরাস কেবল তামাক গাছকেই আক্রমণ করে। এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট ভাইরাস সুনির্দিষ্ট প্রকার পোষক কোষকেই আক্রমণ করে থাকে।

ইমার্জিং ভাইরাস (Emerging virus) : ভাইরাসের পরজীবিতা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাস কখনো কখনো স্বাভাবিক পোষক প্রজাতি থেকে সম্পর্কহীন অন্য পোষক প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফ্লু (Flu) বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকৃত পোষক ছিল পাখি যা পরবর্তীতে সরাসরি মানুষে রোগ বিস্তার করে। ১৯১৮–১৯১৯ সালে পৃথিবীতে ২১ মিলিয়নের বেশি মানুষ এ ফ্লুতে মারা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা HIV-এর প্রকৃত পোষক বানর, যা পরে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। আদি পোষক থেকে পরে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টিকারী এসব ভাইরাসকে বলা হয় ইমার্জিং ভাইরাস (emerging virus); উদাহরণ– HIV, SARS, Nile virus, Ebola, নভেল করোনা ভাইরাস।

ভিরিয়ন (Virion) : নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিওক্যাপসিড। প্রতিটি ভিরিয়নে সর্বোচ্চ ২০০০ হতে ২১৩০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে।

MENINGES Academic And Admission Care

CamScanner

সাবভাইরাল সত্ত্বা (Subviral agents)

ভিরয়েডস (Viroids) : ভিরয়েডস হলো সংক্রামক RNA। Theodore Diener (US এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট) এবং W. S. Rayner ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিরয়েডস আবিষ্কার করেন। **ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA অণু যা কয়েক শত নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহুগুণে ক্ষুদ্র।** কেবলমাত্র উদ্ভিদেই ভিরয়েডস পাওয়া যায়। এরা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে এবং মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ পোষকের এনজাইম ব্যবহার করে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানিগণ এখন ধারণা করছেন হেপাটাইটিস-ডি এর কারণ ভিরয়েডস। ভিরয়েড নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগ তৈরি করে।

প্রিয়নস (Prions [Pr = Proteinaceous; i = infectious; on = particle]) : সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হলো প্রিয়নস। এটি নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন প্রোটিন আবরণ; মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের Kuru এবং Creutzfeldt রোগ; ভেড়া ও ছাগলের Scrapie রোগ প্রিয়নস দিয়ে হয়ে থাকে। বহুল আলোচিত **'ম্যাড কাউ'** রোগ সৃষ্টির সাথে প্রিয়নস-এর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে প্রথম Stanley B. Prusiner অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির প্রিয়নস-এর অস্তিত্বের কথা বলেন এবং ভেড়ার স্ক্র্যাপি (Scrapie) রোগে প্রথম পর্যবেক্ষণ (study) করেন। এজন্য তাকে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

স্যাটেলাইট (Satellite) : স্যাটেলাইট হলো কেবল নিউক্লিক অ্যাসিড গঠিত সত্ত্বা যা পোষক কোষের মধ্যে অন্য একটি ভাইরাসের সহায়তায় প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম। যখন কোনো প্রোটিন আবরণ দ্বারা স্যাটেলাইট আবদ্ধ হয়, তাকে **স্যাটেলাইট ভাইরাস** বলে।

ভিরিয়ন, ভিরয়েডস ও প্রিয়নস-এর মধ্যে পার্থক্য

ভিরিয়ন	ভিরয়েডস	প্রিয়নস
১. RNA অথবা DNA থাকে।	১. RNA থাকে কিন্তু DNA থাকে না।	১. নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে না।
২. এতে প্রোটিন থাকে।	২. এতে প্রোটিন থাকে না।	২. এতে শুধু প্রোটিন থাকে।
৩. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে।	৩. শুধু উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে।	৩. শুধু প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে।

MENINGES Academic And Admission Care

ভাইরাসের গঠন

১। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV (Tobacco Mosaic Virus) : এটি দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। এটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় ১৭ গুণ। TMV এর দৈর্ঘ্য ২৮০ nm–৩০০ nm এবং প্রস্থ ১৫ nm–১৮ nm। কেন্দ্রে RNA এবং চারপাশে প্রোটিন আবরণ দিয়ে TMV গঠিত। প্রোটিন আবরণকে ক্যাপসিড বলে। ক্যাপসিড বহু উপ-একক দ্বারা গঠিত। উপ একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে। ক্যাপসোমিয়ার কতগুলো আঙ্গুরের থোকার ন্যায় পরপর সজ্জিত থাকে। TMV-তে প্রায় ২১৩০–২২০০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে একসূত্রক RNA কোর (core) আছে। RNA সূত্রটি ৬৫০০টি নিউক্লিয়োটাইড দ্বারা গঠিত। ওজন হিসেবে এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন। TMV এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রত্যেকটি প্রোটিন সাবইউনিটের আণবিক ওজন ১৭০০০ ডাল্টন।

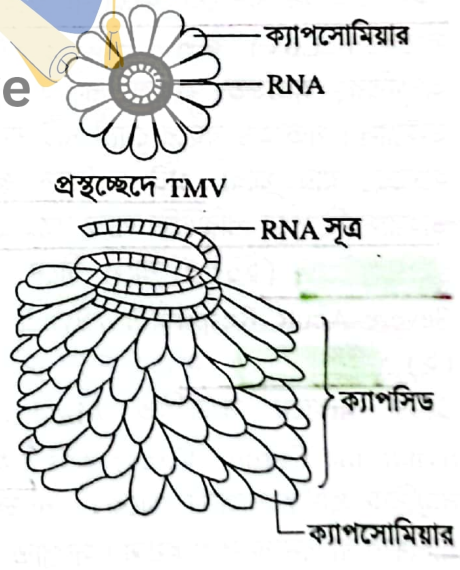

চিত্র ৪.৩ : TMV ভাইরাসের গঠন।

ফায কী? ফায (Phage) একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো 'to eat' বা ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐ সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। ফায-এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং একসময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি ফেলিক্স (d' Herelle Felix) এ ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী Twort ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস তথা T_1 ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

CS CamScanner

২। T_2 ব্যাকটেরিওফায (T₂ Bacteriophage) : এটি একটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। এর গঠন সম্বন্ধেও অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানা গেছে। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা চলে; যথা : মাথা এবং লেজ।

মাথা : মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির প্রিজমের ন্যায় এবং প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩–১০০ nm এবং প্রস্থ ৬৫ nm। থলি আকৃতির এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে এ DNA গঠিত। DNA এর দৈর্ঘ্য ৫০ μm। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ২০০০টি। এতে প্রায় ১৫০টি জিন থাকে। মাথার অধিকাংশ স্থানই ফাঁপা বলে মনে হয়। T_2 ফাযের DNA দ্বিসূত্রক এবং মোট ওজনের প্রায় ৫০%।

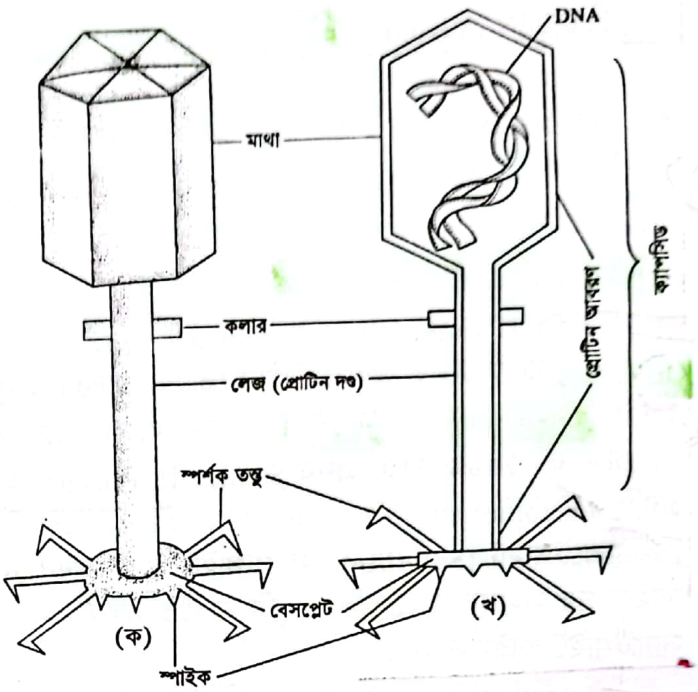

চিত্র ৪.৪ : T_2 ব্যাকটেরিওফায এর গঠন : (ক) পূর্ণাঙ্গ গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ।

লেজ : মাথার পেছনে সরু অংশটির নাম লেজ। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫–১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫–২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে এবং লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। এর অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে ১টি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো কয়েকটি স্পাইক এবং ছয়টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এতে নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম, কোষ প্রাচীর ও অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ ইত্যাদি নেই।

৩। COVID-19 সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাস : Coronaviridae গোত্রের দ্বিস্তরী লিপিড আবরণে বেষ্টিত (enveloped) ও মুকুটের মতো (crownlike) (ল্যাটিন corona অর্থ মুকুট) বৃহৎ ভাইরাস কণাকে করোনা ভাইরাস (Corona Virus, সংক্ষেপে CoV) বলে। এটি 27-32 Kb (কিলোবেইস) আকৃতির, অখণ্ডিত, গোলাকার, একসূত্রক ও বৃহত্তম RNA ভাইরাস। গত ২৪ বছরে মোট ৪টি করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে ৩টি ভাইরাস জুনোটিক (মানুষ/প্রাণী) ভাইরাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এগুলো হলো– (১) SARS-CoV (২০০৩ সালে চীনে বাদুড় থেকে সংক্রমিত Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus), (২) MERS-CoV (২০১২ সালে সৌদি আরবে বাদুড় থেকে উটের মাধ্যমে সংক্রমিত Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) এবং (৩) SARS-CoV-2 (ধারণা করা হচ্ছে- এ ভাইরাসটির উৎপত্তি বাদুড় থেকে বা সামুদ্রিক প্রাণী/বন্যপ্রাণী থেকে)। **নভেল করোনা ভাইরাস** বলতে নতুন করোনা ভাইরাসকে বোঝায় যা আগে কখনো আবিষ্কার বা শনাক্ত করা হয়নি। সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে সংক্রমিত COVID-19 সৃষ্টিকারী SARS-CoV-2 ভাইরাসটি নামকরণের আগে '2019 Novel Corona Virus' সংক্ষেপে **2019-NCoV** নামে পরিচিত ছিল। এ ভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগটি অন্যান্য করোনা ভাইরাস সৃষ্ট সাধারণ ঠাণ্ডা লাগাসদৃশ রোগের মতো নয়। নভেল করোনা ভাইরাসের সারা গায়ে অসংখ্য স্পাইক আছে যা প্রোটিন দিয়ে গঠিত। মানবদেহের কোষ প্রোটিনের সাথে জোড় বেঁধে দেহকোষে প্রবেশ করে এবং কোষের DNA-কে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে। নভেল করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম COVID-19 [Corona থেকে CO, Virus থেকে VI এবং Disease থেকে D, 2019 = সংক্রমণ বা সংগ্রহের বছর]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO = World Health Organization) COVID-19-কে **Pandemic** অর্থাৎ বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে ঘোষণা করেছে।

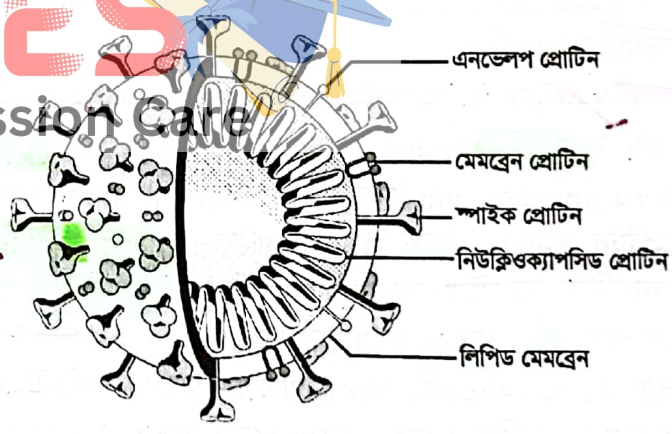

চিত্র ৪.৫ : করোনা ভাইরাসের অতি-আণুবীক্ষণিক গঠন

MENINGES Academic And Admission Care

CamScanner

এন্ডেমিক (Endemic) : যে জুনোটিক ব্যাধি একটি সংকীর্ণ অঞ্চল বা জনসংখ্যায় পাওয়া যায়। যেমন– মধ্যপ্রাচ্যের MERS-CoV।

এপিডেমিক (Epidemic) : যে জুনোটিক ব্যাধি বেশ বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। যেমন– পশ্চিম আফ্রিকার Ebola Virus Disease = EVD।

প্যানডেমিক (Pandemic) : যে জুনোটিক ব্যাধি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। যেমন- COVID-19।

ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Replication of virus) : বিশেষ উপায়ে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে থাকে এবং প্রতিটি নতুন ভাইরাস দেখতে হুবহু একই রকম হয়। একটি পরিপূর্ণ ভাইরাস কখনো পূর্বস্থিত (Pre existing) কোনো ভাইরাস থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয় না। এছাড়া ভাইরাস অকোষীয় তাই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **জীবন চক্র বলা হয় না**, বলা হয় **সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া**। ব্যাকটেরিওফায-এর সংখ্যাবৃদ্ধি দু'ভাবে ঘটে থাকে; যথা– (ক) **লাইটিক চক্র** বা ভাইরুলেন্ট চক্র এবং (খ) **লাইসোজেনিক চক্র** বা টেমপারেট দশা। T-সিরিজভুক্ত ফাযে অর্থাৎ T_2, T_4, T_6 ইত্যাদিতে লাইটিক চক্র ঘটে এবং ল্যামডা ফায (λ-Phage)-এ লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন হয়। নিচে এ দু'ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(ক) লাইটিক চক্র (Lytic cycle) : যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে **লাইটিক চক্র** বা **বিগলনকারী চক্র** বলে। *Escherichia coli (E. coli)* নামক ব্যাকটেরিয়া কোষে T_2 ব্যাকটেরিওফাযের লাইটিক চক্র নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সংঘটিত হয়।

ধাপ-১ : সংযুক্তি বা পৃষ্ঠলগ্নীভবন (Attachment / Landing) : T_2-ব্যাকটেরিওফায সাধারণত *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে থাকে। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরে ফাযপ্রোটিনের জন্য **রিসেপ্টর সাইট** (receptor site) থাকে। রিসেপ্টর সাইটের প্রোটিনের সাথে ফায ক্যাপসিডের স্পর্শক তন্তুর প্রোটিনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে T_2-ফায দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হলো আক্রমণের সূচনা।

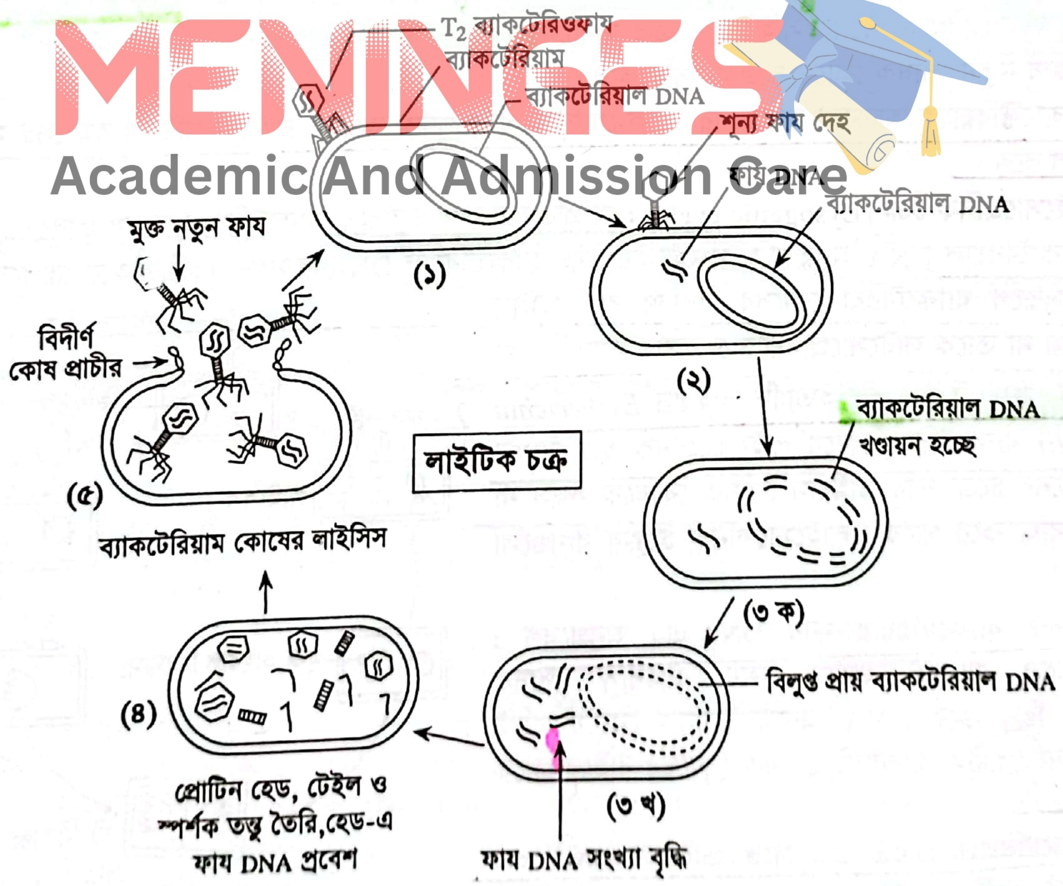

চিত্র ৪.৬ : T_2 ব্যাকটেরিওফায-এর লাইটিক চক্র।

MENINGES Academic And Admission Care

CamScanner

ধাপ-২ : ফায DNA অণু প্রবেশ (Penetration) : ব্যাকটেরিওফাযের দণ্ডাকৃতি লেজটি সংকুচিত হয়ে বিশেষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংযোগ স্থানের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরি করে এবং ফায-DNA কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ মেমব্রেন ভেদ করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করিয়ে দেয়। শূন্য প্রোটিন আবরণটি বাইরেই থেকে যায়। [আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক ভাইরাসের সম্পূর্ণ দেহটিই পোষক কোষে প্রবেশ করে। পরে পোষক কোষের এনজাইম প্রোটিন আবরণটিকে বিগলিত করে ফেলে এবং ভাইরাস-নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) মুক্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে লাইটিক চক্র ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।]

ধাপ-৩ : প্রতিলিপন (Replication) : ফায DNA পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর তার নিজস্ব প্রোমোটার সিকোয়েন্স দ্বারা পোষক কোষের RNA পলিমারেজকে আকৃষ্ট করে। পোষক কোষের RNA পলিমারেজ ব্যবহার করে ফায mRNA তৈরি করে। ফায mRNA পরে প্রোটিন তৈরি করে এবং একটি বিশেষ প্রোটিন *E. coli* DNA-কে খণ্ড বিখণ্ড করে নষ্ট করে দেয়। কাজেই পোষক কোষে ফায DNA-এর কোনো প্রতিযোগী থাকে না। ফায DNA নিউক্লিওটাইড (*E. coli* কোষের বিগলিত DNA থেকে মুক্ত হওয়া) কোষের রাইবোসোম, tRNA, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং নিজের ইচ্ছেমতো নতুন ফায DNA প্রতিলিপন করে নেয় এবং ফায **কোট প্রোটিন** (coat protein) তৈরি করে। কোট প্রোটিন মাথা, লম্বা লেজ, স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি অংশ হিসেবে পৃথক পৃথকভাবে তৈরি হয়।

ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া (Assemble) : পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফায DNA এক একটি কোট প্রোটিনের মাথার অংশে প্রবেশ করে। পরে ক্রমান্বয়ে মাথার অংশের সাথে লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিওফায হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি (Release) : পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিওফায তৈরি হওয়ার পর ফায একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি করে যার কার্যকারিতায় পোষক কোষের প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং নতুন সৃষ্ট ব্যাকটেরিওফাযসমূহ মুক্তভাবে বেরিয়ে আসে। মুক্ত হওয়া প্রতিটি ফায একটি নতুন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামকে আক্রমণ করতে সক্ষম। পোষক কোষে বংশগতীয় বস্তু প্রবেশের পর ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং পোষক কোষ ভেঙ্গে অনেকগুলো ভিরিয়ন মুক্ত হয়। ভাইরাসের এ ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে **লাইটিক চক্র** বলে। যেমন-*E. coli* আক্রমণকারী T_2- ফায। এমন প্রকৃতির ফাযকে **লাইটিক ফায বা ভিরুলেন্ট ফায** (virulent phage) বলে। কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ হওয়াকে **লাইসিস** (Lysis) বা বিগলন বলে। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে প্রায় ৩০০টি নতুন ফায সৃষ্টি হয়ে থাকে। নির্গত নতুন ফায নতুন পোষক কোষে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

পোষক ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার পর থেকে যে সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ অপত্য ভাইরাস সৃষ্টি না হয় সেই সময় কালকে ইকলিপস কাল বলে।

(খ) লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic cycle) : যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNA-টি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাকটেরিয়াল DNA-র সঙ্গে একত্রিত হয়ে রেপ্লিকেট করে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ বা লাইসিস ঘটিয়ে মুক্ত হয় না তাকে **লাইসোজেনিক চক্র** বলে। ল্যামডা ফায (λ-ফায), P_1 ফায, M_{13} ফায ইত্যাদি ভাইরাস *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া কোষে লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন করে। এ ধরনের চক্রে ফায ভাইরাস পোষক কোষকে ধ্বংস না করেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। লাইসোজেনিক চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

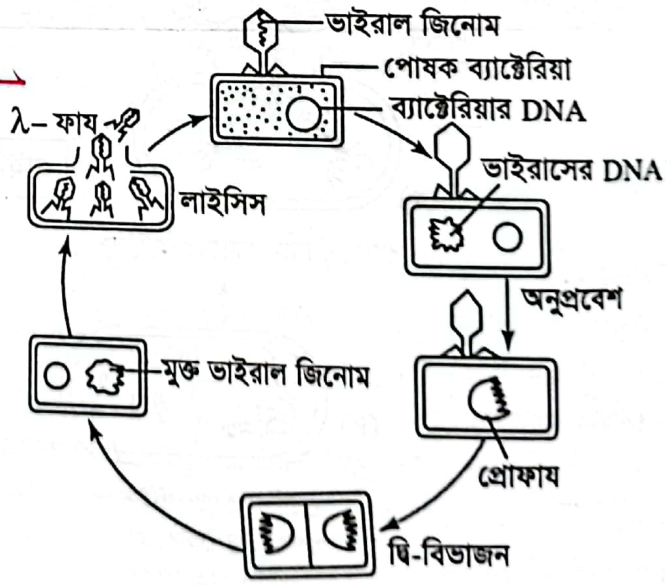

চিত্র ৪.৭ : লাইসোজেনিক চক্র

১। পোষক ব্যাকটেরিয়ায় ফায DNA-এর অনুপ্রবেশ : লাইটিক চক্রের মতোই প্রথমে ফায ভাইরাস পোষক কোষপ্রাচীরকে ছিদ্র করে DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবিষ্ট করায় এবং শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরে থেকে যায়।

২। ব্যাকটেরিয়াল DNA এর সঙ্গে ভাইরাস DNA এর সংযুক্তি : এ পর্যায়ে নিউক্লিয়েজ এনজাইম ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে একটি জায়গায় কেটে ফেলে। এ কাটা স্থানে ফায DNA-টি গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের সংযুক্তিতে ইন্টিগ্রেজ এনজাইম

CamScanner

বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যাকটেরিয়ার DNA-র সঙ্গে সংযুক্ত ফায ভাইরাস DNA-টিকে প্রোফায (prophage) বলে। এটি ব্যাকটেরিয়ায় সুপ্তাবস্থায় থাকে। ফায DNAসহ *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জিনোম একসাথে একটি নতুন জিনোম তৈরি করে। প্রত্যেকবার সংখ্যাবৃদ্ধির সময় ব্যাকটেরিয়াল DNA-এর অনুরূপ ভাইরাল DNA অণুটিও রেপ্লিকেট করতে থাকে। এভাবে প্রতিটি অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় ভাইরাস DNA-র একটি কপি সংযুক্ত হতে থাকে। তবে প্রয়োজন হলে পোষক DNA থেকে ফায DNA পৃথক হয়ে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

লাইসোজেনিক ভাইরাস কেবল Bacterophages-এ সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রাণী ও মানুষকে আক্রমণ করতে পারে। *Herpes simplex* ভাইরাস এমন একটি ভাইরাস।

লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
১। গঠনগত	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটিয়ে থাকে।	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অণুটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে রেপ্লিকেট করে।
২। বিদারণ	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয়।	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয় না।
৩। বিভিন্ন সিরিজ	T-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইটিক চক্র দেখা যায়।	λ (ল্যামডা)-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়।
৪। সৃষ্টি	লাইটিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়।	লাইসোজেনিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জিনোমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।
৫। নিয়ন্ত্রণ	এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি পোষক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬। প্রোফাজ গঠন	গঠিত হয় না।	গঠিত হয়।
৭। আক্রমণের তীব্রতা	আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভিরুলেন্ট।	পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পারেট।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Viruses) : মানবকুলের জন্য ভাইরাস যত না উপকারী তার চেয়ে বেশি অপকারী। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ভাইরাসের অপকারিতা : ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যেমন–

১। **ভাইরাস মানবদেহে** বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, কোভিড-১৯, ভাইরাল হেপাটাইটিস, মাংকি পক্স, ক্যাপোসি সার্কোমা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২। **বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে** যেমন-সিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কুঁচকাইয়া যাওয়া), পেঁপের লিফকার্ল, ক্লোরোসিস, ধানের টুংরো রোগসহ প্রায় ৩০০ উদ্ভিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পায়।

৩। **পোষা প্রাণীতে রোগ সৃষ্টি :** গরুর বসন্ত; গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর 'ফুট এ্যান্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।

৪। **ফায ভাইরাস** মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে থাকে।

৫। **বহুল আলোচিত 'এইডস্'** রোগের কারণ হিসেবেও বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে দায়ী করেছেন। HIV (Human Immunodeficiency Virus) দিয়ে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome বা Acquired Immuno Deficiency Syndrome) রোগ হয়। AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (হ্রাস) Syndrome (অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ **বিশেষ কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস বা কমে যাওয়াকে এইড্স** (AIDS) বলে। HIV দিয়ে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে

রোগীর অকাল মৃত্যু অবধারিত হয়। বাংলাদেশে ক্রমেই এইডস্ রোগীর সংখ্যা এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাষ্য মতে ২০২৩ সালে বাংলাদেশে HIV রোগীর সংখ্যা ৯৭০৮ জন।

৬। **ইবোলা ভাইরাস (Ebola virus) :** ইবোলা ভাইরাস একসূত্রক RNA দ্বারা গঠিত। আফ্রিকার জায়ার-এ Ebola virus-এর আক্রমণে মহামারি দেখা দেয়। Ebola ভাইরাসের আক্রমণে দেহের কোষ ফেটে যায়। Ebola একটি মারাত্মক মারণ ভাইরাস। এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে আফ্রিকার কঙ্গোর ইবোলা নদীর তীরে প্রথম এক কৃষক মারা যায়। উক্ত রোগী মারা গিয়েছিল চোখ, নাক, কান ও গলায় রক্তক্ষরণ হয়ে। তখন উক্ত নদীর নামানুসারে ঐ ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছিল **ইবোলা ভাইরাস**। স্পর্শের মাধ্যমেই নতুন ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হওয়ার ২–২১ দিনের মধ্যে রোগীতে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২০১৪ সালের শেষ এবং ২০১৫ সালের ১ম প্রান্তে পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মহামারি আকারে ইবোলা ছড়িয়ে পরে এবং ২৫০ স্বাস্থ্যকর্মীসহ প্রায় এগারো হাজার লোক মারা যায়। এর ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

৭। **জিকা ভাইরাস (Zika virus) :** জিকা ভাইরাস একটি ফ্লাভিভাইরাস। এটি Flaviviridae গোত্রের একটি RNA ভাইরাস যা ১৯৫২ সালে বানরের রক্ত থেকে এবং ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়ায় মানুষের দেহ থেকে পৃথক করা হয়।। ১৯৪৭ সালে উগান্ডার Zika Forest-এ বসবাসকারী রেসাস বানরের দেহে এ ভাইরাস প্রথম ধরা পরে। উগান্ডার ভাষায় *Zika* অর্থ Overgrown। বর্তমানে *Aedes aegypti, A. albopictus* মশকীর মাধ্যমে এ ভাইরাস সম্প্রতি ব্রাজিলসহ লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে মৃত্যু হার কম কারণ এর দ্বারা সাধারণত মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি আক্রান্ত হয় না। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়। জিকাবাহী মশকী উড়ে একদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে পারে, তাই এটি একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকার-প্রতিরোধ ডেঙ্গুর মতোই। এ ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে সামান্য জ্বর, র‍্যাশ, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, চক্ষু লাল হওয়া, মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, দেহে ফুসকুড়ি ওঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। গর্ভবতী নারীদের দেহে জিকার সংক্রমণ হলে নবজাতক শিশু অপেক্ষাকৃত ছোটো আর অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়। চিকিৎসকের ভাষায় এ ত্রুটিকে মাইক্রোসেফালি বলা হয়। ব্রাজিলে সম্প্রতি এ ত্রুটিযুক্ত নবজাতক জন্মানোর তথ্য সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে।

MENINGES
Academic And Admission Care

জিকার সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো। এ অঞ্চলে এরই মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসটি। এছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অধিবাসীরাও সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় ৬৭ বছর বয়সী এক মহিলার রক্তে জিকা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুয়ের্তো রিকো অঞ্চলে জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০ জন রোগীর মধ্যে প্রথম একজন রোগী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৮। **নিপা ভাইরাস (Nipah virus) :** নিপা ভাইরাস Paramyxoviridae পরিবারভুক্ত একটি RNA ভাইরাস যার গণ নাম *Henipavirus*. ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় শূকরের খামারে প্রথম ধরা পড়লেও দ্রুত দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পরে। বাদুর এ ভাইরাসটির বাহক এবং কাঁচা খেজুরের রসের মাধ্যমে এ ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত (অনুপ্রবেশ) হয়। এ ভাইরাসের আক্রমণে শ্বসন জটিলতায় মানুষসহ গৃহপালিত পশুপাখির মৃত্যু ঘটে।

৯। **সার্স** (SARS-Severe Acute Respiratory Syndrome) ভাইরাসের কারণে চীন, তাইওয়ান, কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। MERS (Middle East Respiratory Syndrome) ভাইরাসও একটি মারাত্মক ভাইরাস।

১০। **বার্ড ফ্লু** (Bird Flu)- একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বার্ড ফ্লু মহামারি আকারে হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছরই হাজার হাজার মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H_5N_1 (Hemaglutinin types-5–Neuraminidase type-1) ভাইরাসের আক্রমণে হাঁস-মুরগিতে বার্ড ফ্লু নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় যা পোল্ট্রি শিল্পকে ধ্বংস করে।

১১। **সোয়াইন ফ্লু**- Swine Influenza virus (SIV) দ্বারা সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সোয়াইন ফ্লু শনাক্ত করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের Subtype H_5N_1 ও H_1N_1 (Hemaglutinin type-1–Neuraminidase type-1)-এর কারণে এ ফ্লু ঘটে থাকে। এ ভাইরাস দ্বারা মানুষ ও শূকর আক্রান্ত হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভারতে বহু লোক (২১০০) মারা যায় এবং ৩৪,০০০ মানুষ আক্রান্ত হয়। বিশ্বায়নের যুগে এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে মেক্সিকো থেকে সারা বিশ্বে।

CS CamScanner

১২। **হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস** দিয়ে মানুষের লিভার ক্যান্সার, পেপিলোমা ভাইরাস দিয়ে এনোজেনিটাল (জরায়ুর মুখ) ক্যান্সার, **হার্পিস সিমপ্লেক্স দিয়ে ক্যাপোসি সার্কোমা** ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৩। মানুষের অসুস্থ হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হলো সর্দিজ্বর (common cold)। **বিভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলো ভাইরাস এর জন্য দায়ী; তাই এর জন্য কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।**

১৪। **চিকুনগুনিয়া (Chikungunya)** : এটি এক প্রকার RNA ভাইরাসজনিত জ্বর। এ ভাইরাস α গোত্রভুক্ত। *Aedes aegypti* এবং *A. albopictus* মশকী দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে এ রোগ ছড়ায়। এ ভাইরাসটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৫২ সালে আফ্রিকার তানজানিয়ায়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। ২০১৭ সালে এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এ রোগে উচ্চজ্বর, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, শরীরে র‍্যাশ ওঠা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকের জ্বর কমে গেলেও ব্যথা ৩–৪ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

১৫। **COVID-19 :** এ রোগ নভেল করোনা ভাইরাস (SARS-CoV-2) সংক্রমণে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ : করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে (ক্ষেত্রবিশেষে ২৭ দিনের মধ্যে) রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এজন্য সন্দেহভাজন (যার লক্ষণ প্রকাশিত হয়নি কিন্তু আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে) ব্যক্তিকে ১৪ দিন **কোয়ারেনটাইনে** রাখতে হয়। কোয়ারেনটাইন হলো নিজেকে একটি ঘরে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ করে রাখা। এ সময় কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ, মেলামেশা না করা। এ অবস্থায় বাড়িতে থাকলে বলা হয় **হোম কোয়ারেনটাইন**, হাসপাতাল বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে থাকলে তাকে বলা হয় **প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেনটাইন। মার্চ ২০২১ পরবর্তী ছড়িয়ে পড়া ভারতীয় ডেল্টা প্রকরণ ২-৩ দিনেই অতিমারাত্মক আকার ধারণ করে। এতে দ্রুতই দেহে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়।**

লক্ষণ : (i) প্রথম প্রকাশ পায় জ্বর। এরপর (ii) শুকনো কাশি এবং কিছুদিন পর (iii) শ্বাসকষ্ট। এসব প্রধান লক্ষণ। (iv) এ ছাড়া সর্দি, গলাব্যথা, মাথাব্যথা, দুর্বলবোধ, পাতলা পায়খানা, এমনকি মাংসপেশিতে ব্যথা। (iv) শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়ার মতো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বিশেষ কথা : স্থান ও রোগীভেদে আরো কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। তার মধ্যে খাবারে কোনো স্বাদ না পাওয়া একটি। বাংলাদেশে প্রায় ৪০% ব্যক্তির কোনো লক্ষণ ছাড়াই পরীক্ষায় পজিটিভ আসছে।

MENINGES
Academic And Admission Care

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশনে রাখতে হয়। আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তিও এ সময় কোনো সুস্থ লোকের সাথে দেখা করা, মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকবেন এবং চিকিৎসা নিবেন।

প্রতিষেধক : ইতোমধ্যে বেশ কয়েক ধরনের টিকা আবিষ্কার ও প্রয়োগ শুরু হয়েছে। তবুও **প্রতিরোধ ব্যবস্থাই** উপযুক্ত ব্যবস্থা। প্রতিরোধব্যবস্থা হলো সুস্থ ব্যক্তির জন্য।

(i) রোগী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা, (ii) জনসমাগম এড়িয়ে চলা, (iii) সম্ভব হলে ঘরে থাকা, (iv) অপরিষ্কার হাতে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ না করা, (v) কারো সাথে (বিশেষ করে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে) হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি না করা, (vi) গণপরিবহণ ও লিফট ব্যবহার না করা, (vii) পশুপাখির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা, (viii) বারবার (বিশেষ করে তেমন কিছু স্পর্শ করলে) সাবান পানি দিয়ে অন্তত বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়া, (ix) অন্য ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরে থাকা। (x) উন্নত মানের মাস্ক ব্যবহার করা যা ৪০% পর্যন্ত সংক্রমণ কমাতে পারে। (xi) হাসপাতালকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। (xii) Hand sanitizer-এর ওপর ভরসা না করে সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া।

COVID-19 রোগ কীভাবে ছড়ায়? রোগীর হাঁচি, কাশি, থুথু ও কথার সময় নির্গত জলকণার (droplet) মাধ্যমে ছড়ায়, তাই রোগী থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরে অবস্থান করতে হয়। ধূলি কণার মাধ্যমে বাতাসে কিছুটা ছড়াতে পারে। কোনো বস্তুর সাথে লেগে থাকা ড্রপলেটের স্পর্শে আসলেও ছড়াতে পারে। ভাইরাস রয়েছে এমন কিছুতে হাত দেওয়ার পর সে হাত দিয়ে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করলে। আক্রান্ত মানুষ থেকে মানুষে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত টিস্যু পেপার, কাপড়, দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র থেকে। একটি আবরণে আবৃত থাকে বলে ভাইরাস ৫ দিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

আক্রান্ত অঙ্গ : নভেল করোনা ভাইরাসের টার্গেট অঙ্গ শ্বসনতন্ত্র, যা নাক-মুখ দিয়ে প্রবেশ করে ফুসফুসে পৌঁছায়। দুর্বল ব্যক্তির (শিশু, বয়স্ক এবং পূর্ব থেকে ডায়াবেটিস, কিডনি ও হার্টের রোগী) সহজেই নিউমোনিয়া হয়ে যায়, তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে ভেন্টিলেশনের। তবে গবেষণায় দেখা গেছে এরা ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে ফেলে। এসব রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

CamScanner

চিকিৎসা : রোগীতে প্রকাশিত উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয় যেমন–অক্সিজেন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি। এছাড়া ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে জাপানি ওষুধ অ্যাভিগান, আমেরিকার রেমডেসিভির (Remdesivir), কিউবার ইন্টারফেরন আলফা টু-বি এবং ফ্যাভিপিরাভির (Favipiravir) ব্যবহারে। মুমূর্ষু রোগীদের ক্ষেত্রে প্লাজমা থেরাপিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছে এমন ব্যক্তির রক্তের প্লাজমাতে এ ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। তাই সুস্থ ব্যক্তি থেকে নেওয়া প্লাজমা নতুন রোগীর দেহে প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়, যাকে বলা হয় **প্লাজমা থেরাপি**। রাশিয়ার **অ্যাভিফ্যাভির**, চীনের **করোনাভ্যাক, অক্সফোর্ড** বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের উদ্ভাবিত **টিকা** আশার আলো নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। **ডেক্সামেথাসন** সিরিয়াস রোগীর ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফল দিচ্ছে। বাংলাদেশের **বঙ্গভ্যাক্সকে** মানুষের ওপর পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সংক্রমণ পরীক্ষা : RT-PCR পরীক্ষা উত্তম। Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction হলো RT-PCR। এ পরীক্ষায় পজিটিভ হলে অবশ্যই সেই ব্যক্তি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত। নেগেটিভ হলে আক্রান্ত থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কারণ ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব সেম্পল নেয়া সঠিক মতো না হলে আক্রান্ত ব্যক্তিও নেগেটিভ আসতে পারে। বুকের এক্স-রে নিউমোনিয়া নিশ্চিত করে।

WHO (World Health Organization) COVID-19-কে Pandemic অর্থাৎ বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে ঘোষণা করেছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের উহানে এটি প্রথম শনাক্ত হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীবাসী এ সম্বন্ধে প্রথম জানতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সকল দেশ (২১৩টি) এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং ১০ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত বিশ্বে মোট আক্রান্ত ৬২৬৭৩৭৬৭১ জন এবং মোট মৃত্যু ৬৫৬১২৭৯ জন, যা ক্রমবর্ধমান। ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম ৩ জন COVID-19 রোগী শনাক্ত হয় এবং ১০ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ২০২৯৭২৩ জন ও মৃত্যু ২৯৩৮১ জন। এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

WHO করোনা মহামারীর জরুরি অবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করেছে ৫ই মে ২০২৩ তারিখ। ঐ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ছিল ৬৮ কোটি ৭৭ লক্ষ এবং মোট মৃত্যু ছিল ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার। (এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রকৃত মৃত্যু ২ কোটির মতো।)

১৬। হিউম্যান হার্পিস ভাইরাসেস : এটি *Rhadino* গণের এবং DNA ভাইরাস। এর দ্বারা ক্যাপোসি সারকোমা (HIV সম্পর্কিত রোগীদের ত্বক ক্যান্সার) রোগ হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভাইরাসের উপকারিতা : বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন :

১। বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।
২। ভাইরাস হতে 'জন্ডিস' রোগের টিকা তৈরি করা হয়।
৩। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৪। ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত **'জেনেটিক প্রকৌশল'**-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৫। ক্ষতিকারক **ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে** ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৬। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রে NPV (Nuclear Polyhydrosis Virus) কে **কীট পতঙ্গনাশক** হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।
৭। ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে **ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত** থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে।
৮। **টিউলিপ ফুল** (*Tulipa gesneriana*) : লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়ে। একে **ব্রোকেন টিউলিপ** বলে। এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্য বেড়ে যায়।
৯। অস্ট্রেলিয়ার খরগোসের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। Myxovirus-এর সাহায্যে খরগোস নিধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণ : ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণের দুটি উপায় আছে; যথ– (১) **ভ্যাক্সিনেশন বা টিকা প্রদান***। এর মাধ্যমে মানবদেহের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করা হয়। টিকা প্রদান হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা (prevention),

* বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক স্বীকৃত টিকা অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকা, চীনের সিনোভ্যাক, যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার, মডার্না এবং জনসন এ্যান্ড জনসন ইত্যাদি। রাশিয়ার স্পুটনিক টিকাও কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। অনেক দেশ ব্যাপকহারে টিকা প্রয়োগ করে রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশেও গণহারে টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। এখনও তা চলমান আছে।

CamScanner

(২) অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ যা দিয়ে রোগের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। ইন্টারফেরন একটি অ্যান্টিভাইরাস ড্রাগ। অনেক উদ্ভিদেও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান আছে। ইন্টারফেরন ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

ভাইরাস দেহে কোনো মেটাবলিজমের ব্যবস্থা নেই, তাই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটি প্রতিরোধ করা যায় না। কিছু ভাইরাল এনজাইমকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী কয়েকটি ভাইরাস

উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস

ভাইরাসের নাম	পোষকদেহ	সৃষ্ট রোগের নাম
টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus)	তামাক	তামাকের মোজাইক রোগ
বীন মোজাইক ভাইরাস (Bean Mosaic Virus)	সিম	সিমের মোজাইক রোগ
বুশিস্টান্ট ভাইরাস (Bushystant Virus)	টমেটো	টমেটোর বুশিস্টান্ট রোগ
টুংরো ভাইরাস (Tungro Virus)	ধান	ধানের টুংরো রোগ
বানচি টপ ভাইরাস (Banchy Top Virus)	কলা	কলার বানচি টপ রোগ
পট্যাটো মোজাইক ভাইরাস (Potato Mosaic Virus)	গোলআলু	গোলআলুর মোজাইক রোগ

প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস

ভাইরাসের নাম	পোষকদেহ	সৃষ্ট রোগের নাম
HIV ভাইরাস	মানুষ	AIDS (রোগের নয়, লক্ষণ সমষ্টি)
ফ্ল্যাভি ভাইরাস (Flavi virus)	মানুষ	ডেঙ্গু/ডেঙ্গী জ্বর
ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_5N_1) ভাইরাস	হাঁস-মুরগি, পাখি	বার্ড ফ্লু
চিকুনগুনিয়া ভাইরাস	মানুষ	চিকুনগুনিয়া
ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_1N_1) ভাইরাস	মানুষ, শূকর	Swine flue
Nipah virus	মানুষ	SARS
র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabis virus)	মানুষ	জলাতঙ্ক
ভেরিওলা ভাইরাস (Variola virus)	মানুষ	গুটি বসন্ত (small pox)
Varicella-Zoster virus	মানুষ, পশুপাখি	জলবসন্ত (chicken pox)
Adeno virus	মানুষ	ভাইরাল নিউমোনিয়া
Ebola virus	মানুষ	কোষের লাইসিস (lysis)
Rhino virus	মানুষ	সাধারণ সর্দি
রুবিওলা ভাইরাস (Rubeola virus)	মানুষ	হাম
পোলিও ভাইরাস (Polio virus)	মানুষ	পোলিওমাইলাইটিস
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus)	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা
হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus)	মানুষ	হার্পিস
হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B)	মানুষ	জন্ডিস/লিভার ক্যান্সার
ইয়েলো ফিভার ভাইরাস (Yellow Fever virus)	মানুষ	পীত জ্বর
ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস (Vaccinia virus)	গরু	গো-বসন্ত
'ফুট অ্যান্ড মাউথ' ভাইরাস (Foot and Mouth virus)	গরু/ভেড়া/ছাগল/মহিষ	পা ও মুখের ক্ষত (ফুট অ্যান্ড মাউথ)
পলিওমা ভাইরাস (Polioma virus)	ইঁদুর	ইঁদুরের টিউমার
হার্পিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex)	মানুষ	ক্যাপোসি সার্কোমা
নভেল করোনা (SARS-CoV-2) ভাইরাস	মানুষ	COVID-19
পেপিলোমা ভাইরাস (Pepiloma virus)	মানুষ	এনোজেনিটাল ক্যান্সার

কাজ : T_2 ফায-এর গঠন চিত্রের একটি পোস্টার অঙ্কন করো এবং ক্লাসে উপস্থাপন করো।
উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, ইরেজার, রং পেন্সিল ইত্যাদি।

MENINGES Academic And Admission Care
CamScanner

ভাইরাসজনিত রোগসমূহ (Viral diseases)

ভাইরাস বলতেই রোগ সৃষ্টিকারী বিষাক্ত বস্তু বোঝায়। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখির বহু রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি ভাইরাসজনিত রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো।

রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস শনাক্তকরণ ও ওষুধ আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কি বিজ্ঞানী হার্ভি জে অল্টার, চার্লস রাইস এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল হগটন।

(ক) ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis) : সাধারণত লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হ লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বা সংক্ষেপে হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারে স্থায়ী আক্রম গড়ে তোলে, যা ১০–১৫ বছরের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়।

রোগের কারণ : হেপাটাইটিস রোগের কারণ হেপাটাইটিস-B ভাইরাস (HBV)। এছাড়া হেপাটাইটিস-A ভাইরাস (HAV) হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV) যাকে বলা হয় 'তুষের আগুন' /নীরব ঘাতক এবং আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ সময় মারা যায়; হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) ও হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV) দিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। **অধিকাংশ হেপাটাইটিস, হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের আক্রমণে ঘটে থাকে।** হেপাটাইটিস-C অবশ্য হেপাটাইটিস-B অপেক্ষা অধিক মারাত্মক।

হেপাটাইটিস-B ভাইরাস একটি DNA ভাইরাস। এর DNA দ্বিসূত্রক এবং বৃত্তাকার। এ ভাইরাসে প্রোটিন আবরণের ওপর আর একটি আবরণ থাকে। এ ভাইরাস বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন–

- আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
- অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

এছাড়া মাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিস্টেইন বার ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, হার্পিস জোস্টার ভাইরাস কোনো সময় শিশুর হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। নিম্নে হেপাটাইটিস ভাইরাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাস গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএনএ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক অ্যাসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA
আয়তন	২৭ nm	৪২ nm	৩০–৩৮ nm	৩৫ nm	২৭ nm
সুপ্তিকাল	১৪–২৮ দিন	৪৫–১৮০ দিন	১৪–১৮০ দিন	২১–৪৯ দিন	২১–৫৬ দিন

MENINGES
Academic And Admission Care

রোগের লক্ষণ : রক্তের মাধ্যমে এ রোগ দেহে প্রবেশ করে এবং লিভারে নীত হয় ও লিভারকে আক্রমণ করে। এ ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড (সুপ্তিকাল) ৪৫–১৮০ দিন। ক্রমশ জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব, দুর্বল বোধ, পাতলা পায়খানা, হাড়ের গিঁটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে প্রস্রাব হলুদ হয়, চোখের সাদা অংশ এবং সমস্ত শরীর হলুদ বর্ণ দেখায়, পেটে ও পায়ে পানি জমা হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় অস্বস্তি অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। রক্তে বিলিরুবিনের এবং SGPT এর মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। এ দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। হেপাটাইটিস B নির্ণয়ের জন্য রক্তের এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পরীক্ষা করতে হয়।

নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার : রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। সাধারণত এর কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। নিয়মিত চিকিৎসায় সুস্থ থাকা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া যায় না। এর মূল চিকিৎসা হলো রোগীকে ১০–১২ দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখা। গ্লুকোজের সরবত খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। অড়হড় পাতা, ভুঁই আমলার পাতা ইত্যাদির রস খাওয়ায়ে উপকার পেয়েছেন বলেও অনেকে দাবি করেছেন। Amoxycillin, Metronidazole, ভিটামিন-সি প্রভৃতি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ : প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস-B-এর প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পরপর এবং ৪র্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ

CamScanner

নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রক্ত পরীক্ষা করে এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পজিটিভ হলে B-ভাইরাস আক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে ভ্যাকসিন দেয়া যায় না। মা থেকে শিশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে, তাই সাবধান হতে হবে। রক্ত দেওয়া-নেওয়ায় সাবধান হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। সেলুনে সেভ করা পরিহার করতে হবে। প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত টয়লেট্রিজ দ্রব্য যেমন টুথব্রাশ, রেজার, নেইল কাটার ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা। HAV ও HEV ভাইরাস পানিবাহিত এবং বাকিরা রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়।

(খ) ডেঙ্গু (ডেঙ্গী) জ্বর (Dengue Fever)

রোগের কারণ : ডেঙ্গু (প্রকৃত উচ্চারণ ডেঙ্গী) একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এ ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্ল্যাভিভাইরাস বা ডেঙ্গী ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এ ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti* L. ও *Aedes albopictus* নামক মশকী (স্ত্রী মশা) আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। ২০১৯ জুলাই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। লক্ষাধিক লোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং শতাধিক লোক মারা যায়। ২০১৯ পরবর্তী বছরগুলোতেও প্রতি বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রোগের লক্ষণ : (i) সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর : প্রথমে শীত শীত ভাব হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। জ্বর ১০৩–১০৫° (ডিগ্রি) ফারেনহাইট হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালের জুলাই পরবর্তী ডেঙ্গু জ্বর ১০২° F-এর ওপর ওঠেনি এবং শরীরে ব্যথাও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এটা সম্ভবত জীবাণুর কোনো নতুন প্রকরণ ছিল। সাধারণত স্ত্রী ডেঙ্গু মশা কামড়ানোর ২-৭ দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর তীব্র মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেট ব্যথা, কপাল ব্যথা ও গলা ব্যথা হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে (মাংসপেশি, পিঠ, কোমর, ঘাড়, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়) ব্যথা হয়। মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা এ রোগের বিশেষ লক্ষণ। একে হাড়ভাঙ্গা জ্বর বলে। শরীরে লালচে রঙের র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) দেখা দিতে পারে। বমি বমি ভাব ও খাবারে অরুচি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছালে রক্তক্ষরণ (bleeding) হয়।

(ii) হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর : সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখের কোণে রক্ত জমাট হতে পারে। রক্তে প্লেটিলেট (অণুচক্রিকা) ভীষণ হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(iii) ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম : হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়।

তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

রোগ নির্ণয় : নিম্নে বর্ণিত উপায়ে ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয় করা যায় :

সেরোলজি : রক্ত পরীক্ষায় NSI অ্যান্টিজেন এবং IgG ও IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রামিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্লেটিলেট পরীক্ষা : রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/mm^3 এর অনেক নিচে নেমে আসে।

সেল কালচার : রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

প্রতিকার/চিকিৎসা : ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিলে মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে, তাই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। **ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে।** রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মায়েদের ডেঙ্গু হলে অন্যান্য রোগীর মতোই যত্ন নিতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রতিরোধ : ডেঙ্গু মশা নিধন করাই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এ মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, কাজেই দিনের বেলায় মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে। রোগ প্রতিরোধে দিনের বেলায় মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। এ মশা ময়লা পানিতে জন্মায় না, বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন কনটেইনারে (ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি পাতিল, ডাবের খোসা, ড্রাম ইত্যাদি) রক্ষিত বা সঞ্চিত পরিষ্কার পানিতে জন্মায়, তাই পানির এসব উৎস ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পানি জমতে না দেয়া। এডিস মশা গড়ে ২১ দিন বাঁচে। তাই একই সাথে লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য নিয়মিত পতঙ্গনাশক স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে পতঙ্গনাশক ছাড়াই ডেঙ্গু মশা নিধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

(গ) পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ (Ringspot or mosaic disease of Papaya) : পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ শুরু হয়েছে। পেঁপের রোগ-বালাই অপেক্ষাকৃত কম হলেও কখনো কখনো ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো ভাইরাসঘটিত রিংস্পট রোগ। বাংলাদেশসহ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পেঁপে গাছে এ রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট (Ringspot)।

রোগের কারণ : একটি ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি সাধারণভাবে Papaya ringspot virus বা PRSV নামে পরিচিত। এর গণ *Potyvirus*, গোত্র Potyviridae. PRSV কতকটা দণ্ডাকৃতির, এটি ৭৬০-৮০০ nm লম্বা এবং এর ব্যাস ১২ nm। পেঁপে ছাড়াও এ ভাইরাস কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদে মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে। ক্যাপসিডের বাইরে এর কোনো আবরণ নেই। এটি একটি RNA ভাইরাস। PRSV এর দুটি প্রকরণের (PRSV-p এবং PRSV-w) মধ্যে PRSV-p দিয়ে পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়।

সংক্রমণ : জাব পোকা ও সাদা মাছি (Melon Aphid- *Aplus gossypii* and Peach Aphid- *Myzus persicae*) দ্বারা পেঁপে গাছে পেঁপের রিংস্পট রোগের ভাইরাস সংক্রমিত হয়। কোনো আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে জাব পোকা খাদ্যগ্রহণ করলে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইরাস পোকার দেহে চলে আসে এবং সাথে সাথে কোনো সুস্থ উদ্ভিদে বসলে উহা ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। পোকার দেহে এ ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। যদি পেঁপে বাগানের গাছগুলো পোকার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং বাগানে জাব পোকার সংখ্যা খুব বেশি থাকে তাহলে এ রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ৪ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ ছাঁটার সময় যান্ত্রিকভাবে এ রোগ বিস্তার ঘটাতে পারে।

MENINGES Academic And Admission Care

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : রোগের নাম থেকেই লক্ষণ অনুমান করা যায়। Ring = বৃত্ত, Spot = দাগ অর্থাৎ বৃত্তাকার দাগ প্রকাশ পায়। বৃত্তাকার দাগের প্রকৃতি হলো কেন্দ্রাভিমুখী (Concentric)। রোগাক্রান্ত গাছে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(i) উদ্ভিদ জন্মের সাথে সাথে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। সংক্রমণের ৩০–৪০ দিনের মধ্যে প্রথম রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।
(ii) ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় হলদে-সবুজ মোজাইকের মতো দাগ পড়ে।
(iii) কাণ্ড, পাতার বোঁটা ও ফলে তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত গাঢ় সবুজ দাগ, স্পট বা রিং সৃষ্টি হয়।
(iv) অপেক্ষাকৃত কম বয়সের পাতায়ই রোগ লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়।
(v) আক্রমণ প্রকট হলে পাতায় বহুল পরিমাণে মোজাইক সৃষ্টি হয়, পাতা আকৃতিতে ছোটো ও কুঁকড়ে যায়, গাছের মাথায় বিকৃত আকৃতির ক্ষুদ্রাকায় কিছু পাতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পাতা ঝরে পড়ে। কখনো কখনো পাতার কেবল শিরাগুলো থাকে।
(vi) আক্রান্ত ফলের ওপর পানি ভেজা গোলাকার দাগ পড়ে এবং দাগের মধ্যবর্তী স্থান শক্ত হয়ে যায়।
(vii) পেঁপে হলুদ হয়ে যায়, রিংস্পট লক্ষণ প্রকাশিত হয়, আকার ছোটো হয়ে যায়। অনেক সময় পুষ্ট হবার আগেই ঝরে যায়।
(viii) পেঁপের মিষ্টতা ও পেপেইন হ্রাস পায়।
(ix) ফলন শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

প্রতিকার/নিয়ন্ত্রণ

১। জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

CS CamScanner

২। জাল (net) দিয়ে পুরো জমি (পেঁপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড নামক পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে।

৩। এফিড নামক পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে (রগর বা রক্সিয়ন বা পারফেকথিয়ন 40 ইসি অথবা মেটাসিসটক্স 25 ইসি কীটনাশক 2 মিলিলিটার/1লিটার পানিতে মিশিয়ে) করা যেতে পারে।

৪। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না।

৫। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের প্রুনিং (পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি) বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেঁড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রম ঘটে থাকে।

৬। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম কর্তৃক জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কৃত নতুন জাতের ক্রস প্রোটেকশন করে আবাদ করলে রোগমুক্ত ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. মাকসুদুল আলম আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জিনরহস্য উন্মোচন করেছেন। (এখন তিনি প্রয়াত।)

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১। যে এলাকাতে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সে এলাকায় পেঁপের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে এবং দূরে নতুন এলাকায় রোগমুক্ত চারা দিয়ে চাষ শুরু করতে হবে।

২। ক্রস-প্রোটেকশন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত চারাগাছ থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। মৃদু প্রকৃতির PRSV জীবাণুকে প্রাণিদেহে ভাইরাল টিকাদানের মতো পোষক উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে গাছকে ভাইরাস প্রতিরোধী করা।

৩। PRSV সাধারণত বীজের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় না, তবে প্রকটভাবে আক্রান্ত পেঁপের বীজ ব্যবহার করলে তা ইনোকুলামের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই ঐ ধরনের বীজ ব্যবহার না করা।

৪। ট্রান্সজেনিক জাত ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ। জিনগান পদ্ধতি ব্যবহার করে PRSV'S Coat protein জিনকে ভ্রূণ টিস্যুতে সংযুক্ত করে নতুন ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯৯৮ সালে। ট্রান্সজেনিক জাত দুটি হলো PRSV মুক্ত রেইনবো (Rainbow) ও সানআপ (Sunup)। এ ট্রান্সজেনিক জাত (GMO) PRSV দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভাইরাস ও মানুষের ক্যান্সার

মানুষের প্রায় ৮৫% ক্যান্সার হয়ে থাকে জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমে এবং প্রায় ১৫% ক্যান্সার হয়ে থাকে ভাইরাস দিয়ে; যেমন–

ক্যান্সার	সংযুক্ত ভাইরাস
১। লিভার ক্যান্সার	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস
২। লিম্ফোমা : ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়েল ক্যান্সার	ইপস্টেইন-বার ভাইরাস
৩। টি-সেল লিউকেমিয়া	হিউম্যান টি-সেল লিউকেমিয়া ভাইরাস
৪। এনোজেনিটাল ক্যান্সার	প্যাপিলোমা (ওয়ার্ট) ভাইরাস
৫। ক্যাপোসি সার্কোসা	হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস

৪.২ : ব্যাকটেরিয়া (Bacteria, একবচনে Bacterium)

গ্রিক শব্দ *Bakterion* = little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দটির উৎপত্তি। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে ব্যাকটেরিয়াম) এক ধরনের ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী (হল্যান্ড) অ্যান্টনি ভ্যান লীউয়েনহুক (Antony Van Leeuwenhoek, 1632–1723) ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এগুলোর নাম দেন animalcule বা ক্ষুদ্র প্রাণী। ১৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডন রয়্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত তার অঙ্কিত ছবিতে তিন আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি দেখা যায়। সর্বপ্রথম আণুবীক্ষণিক সমীক্ষায় আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাকে ব্যাকটেরিওলজি ও প্রোটোজুওলজির জনক বলা হয়ে থাকে। জার্মান বিজ্ঞানী এরেনবার্গ (Christian Gottfried Ehrenberg) ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এসব ক্ষুদ্রজীবদের ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাকটেরিয়ার ওপর ব্যাপক গবেষণা এবং ব্যাকটেরিয়া

CS CamScanner

তত্ত্বকে (germ theory of disease) প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে লুই পাস্তুরকে অনেকেই আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলতে চান। জার্মান ডাক্তার রবার্ট কক (Robert Koch) অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীর বহু রোগের কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। তিনি যক্ষ্মা রোগের জন্য দায়ী *Mycobacterium tuberculosis* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন এবং এজন্য তাঁকে ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানুষের দেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে। মানুষের অন্ত্র ও ত্বকে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া থাকে। এদের বেশিরভাগই কোনো ক্ষতি করে না। মানুষের দেহে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশি ভয়ানক এবং এ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে AIDS সংক্রমণে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে।

বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আবাস, রোগতত্ত্ব, বংশবিস্তার ইত্যাদি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় তাকে **ব্যাকটেরিওলজি** বলে।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী (Prokaryotic) জীব। আদিকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না, যেমন নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি কমপ্লেক্স, লাইসোজোম ইত্যাদি নেই। কেবলমাত্র রাইবোসোম থাকে। কোষে একটি দ্বিসূত্রক অখণ্ড, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যা আদি ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এতে হিস্টোন-প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকায়, অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। **এদের কোষে জড় কোষ প্রাচীর থাকে। তাই এরা উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন।**

ব্যাপক অর্থে ব্যাকটেরিয়া বলতে আর্কিব্যাকটেরিয়া (গ্রিক *archaios* = ancient বা আদি), ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রুপকে বোঝায়। বর্তমানে Mycoplasma-কেও ব্যাকটেরিয়া হিসেবে ধরা হয়। এর মধ্যে আর্কিব্যাক্টেরিয়া অন্যান্য গ্রুপ থেকে আলাদা ধরনের। ১৯৭০ সালের আগে আর্কিব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার তেমন পার্থক্য জানা সম্ভব হয়নি, ১৯৯৬ সালে একটি আর্কিব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্সিং করার পর এদের মধ্যকার প্রকট পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায় এদের মোট ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে এদের rRNA-এর বেস সিকুয়েন্সেস ব্যাকটেরিয়ার সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা সুদৃঢ় করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

অধিরাজ্য (Domain) এবং রাজ্য (Kingdom)

১৯৯৬ সালে Carl Woese সব ধরনের জীবের বিস্তারিত জেনেটিক বিশ্লেষণ করে দেখান যে জীবসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তিনটি অধিরাজ্যে বিভাজনযোগ্য।

অধিরাজ্য-১ : Archaea : রাজ্য Archaebacteria
অধিরাজ্য-২ : Bacteria : রাজ্য Eubacteria
অধিরাজ্য-৩ : Eukarya : রাজ্য Protista, Fungi, Plantae, Animalia

বৈশিষ্ট্য	আর্কিব্যাকটেরিয়া	ব্যাকটেরিয়া
১। কোষপ্রাচীর	পেপটিডোগ্লাইকান নেই	প্রধান বস্তু পেপটিডোগ্লাইকান
২। মেমব্রেন লিপিড	ইথার লিংক্ড, শাখান্বিত	এস্টার লিংক্ড, অশাখ
৩। ইনহিবিটর tRNA	মেথিওনিন	ফরমাইল মেথিওনিন
৪। RNA পলিমারেজ	একাধিক	এক ধরনের
৫। জিনের গঠন	ইন্ট্রনস থাকে যা প্রকৃত কোষের বৈশিষ্ট্য	কোনো ইন্ট্রন থাকে না
৬। ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট	Bacterio rhodopsin	Bacterial chlorophyll, chlorophyll-a

আর্কিব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে। এদের কতক Salt lover (Halophiles), কতক Heat lover (Thermophiles) কতক Heat and acid lover (Thermoacidophiles) এবং কতক Methane generater (Methanogens).

Methanopyrus ১১০° সে. তাপমাত্রায়ও টিকে থাকে, ভালো বৃদ্ধি ঘটে ৯৮° সে. তাপমাত্রায়, কিন্তু তাপমাত্রা ৮৪° সে. এর কম হলে মরে যায়। Methanogens প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে দুই বিলিয়ন টন মিথেন গ্যাস মুক্ত করে।

এ পুস্তকে কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh পুস্তকে বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ৪৭২ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ প্রজাতির সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ৬০ প্রজাতির প্রোটিওব্যাকটেরিয়া, ৪২ প্রজাতির ফিরমিকিউট্‌স এবং ৭০ প্রজাতির অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়া হলো জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট, এককোষী, আণুবীক্ষণিক, আদিকেন্দ্রিক অণুজীব যা সাধারণত ক্লোরোফিল বিহীন এবং প্রধানত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। ৩৬০ কোটি বছর পূর্বে আর্কিওজোইক যুগে আদিকোষী জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল। নিচে ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোটো আকারের জীব, সাধারণত ০.২–৫.০ μm (মাইক্রোমিটার) পর্যন্ত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এরা আণুবীক্ষণিক (microscopic)।

২। এরা এককোষী জীব, তবে একসাথে অনেকগুলো কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকতে পারে।

৩। ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক (প্রাককেন্দ্রিক = Prokaryotic)। কোষে 70S রাইবোসোম থাকে; কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না।

৪। ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপ্রোটিন, সাথে মুরামিক অ্যাসিড (Muramic acid) এবং টিকোয়িক অ্যাসিড (Teichoic acid) থাকে।

৫। এদের বংশগতীয় উপাদান (genetic material) হলো একটি দ্বিসূত্রক, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু, যা ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এ বৃত্তাকার DNA কে সোজা করলে কোষের চেয়েও অনেক লম্বা হয়। এটি সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত, এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন-প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া কোষে DNA সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিউক্লিওয়েড অঞ্চল বলা হয়।

৬। এদের বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়া দ্বি-ভাজন (binary fission)। ব্যাক্টেরিয়ার দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৩০ মিনিট সময় লাগে।

৭। এদের কতক পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী, অধিকাংশই মৃতজীবী এবং কিছু স্বনির্ভর (autophytic)।

৮। এরা সাধারণত বেসিক রং ধারণ করতে পারে (গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ)।

৯। ফায ভাইরাসের প্রতি এরা খুবই সংবেদনশীল।

১০। এদের অধিকাংশই অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।

১১। ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু গঠন করে। এ অবস্থায় এরা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

১২। এরা -১৭ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাঁচে।

১৩। প্রকৃত ক্রোমোসোম না থাকায় মাইটোসিস ও মায়োসিস ঘটে না।

১৪। এদের কতক বাধ্যতামূলক অবায়বীয় (obligate anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন থাকলে বাঁচতে পারে না। উদা: *Clostridium*। কতক সুবিধাবাদী অবায়বীয় (facultative anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও বাঁচতে পারে। কতক বাধ্যতামূলক বায়বীয় (obligate aerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। উদা: *Azotobacter beijerinckia*।

MENINGES
Academic And Admission Care

ব্যাকটেরিয়ার বিস্তৃতি ও আবাসস্থল : ব্যাকটেরিয়া মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। মানুষের অন্ত্রেও ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এর মধ্যে *Escherichia coli* (*E. coli*) আমাদেরকে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স সরবরাহ করে থাকে। প্রকৃতিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অর্থাৎ –17°C তাপমাত্রা থেকে শুরু করে 80°C তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। মাটি বা পানিতে যেখানে জৈব পদার্থ বেশি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও সেখানে তত বেশি। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ আবাদি মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাটির যত গভীরে যাওয়া যাবে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণও তত কমতে থাকে এবং সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও কমতে থাকে। জৈব পদার্থসমৃদ্ধ জলাশয়েও বিপুল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া বাস করে। বায়ুতেও ব্যাকটেরিয়া আছে তবে বায়ুস্তরের অনেক উঁচুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না। এক গ্রাম মাটিতে প্রায় ৪০ মিলিয়ন এবং এক মিলিলিটার মিঠা পানিতে প্রায় ১ মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে। অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে। আবার অনেকে প্রাণীর অন্ত্রে মিথোজীবী হিসেবে বাস করে।

CS CamScanner

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়াকে তাদের কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির তারতম্য, ফ্ল্যাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা, স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। নিম্নে এদের মধ্য থেকে তিন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো :

(ক) কোষের আকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ

কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়; যথা– ১। কক্কাস, ২। ব্যাসিলাস, ৩। কমাকৃতি, ৪। স্পাইরিলাম, ৫। বহুরূপি, ৬। স্টিলেট বা তারকাকার এবং ৭। বর্গাকৃতির।

১। কক্কাস (Coccus; G. Kokkos অর্থ berry বা gain, বহুবচনে কক্কাই Pl. Cocci) : যেসব ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি প্রায় গোলাকার তাদেরকে কক্কাস বলে। কক্কাসকে আবার ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস (Micrococcus) : যেসব ব্যাকটেরিয়া গোলাকার এবং একা একা থাকে তাদেরকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস বলে; উদাহরণ- *Micrococcus denitrificans*.

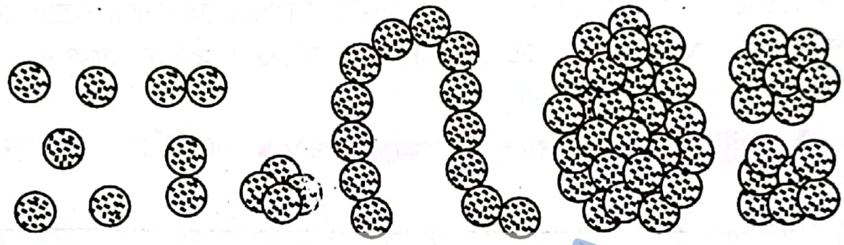

ক খ গ ঘ ঙ চ

চিত্র ৪.৮ : বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া (ক) মাইক্রোকক্কাস, (খ) ডিপ্লোকক্কাস, (গ) টেট্রাকক্কাস, (ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস, (ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং (চ) সারসিনা

MENINGES Academic And Admission Care

(খ) ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus; Diplo অর্থ double) : দেখতে গোলাকার এবং এ ব্যাকটেরিয়াসমূহ জোড়ায় জোড়ায় থাকে; উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae*.

(গ) টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus) : যখন চারটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একই তলে একত্রে বাস করে; উদাহরণ—*Gaffkya tetragena*.

(ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus; Strepto অর্থ twisted chain) : এরাও দেখতে গোলাকার এবং চেইন (chain) বা মালার মতো সাজানো থাকে; উদাহরণ- *Streptococcus lactis*.

(ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus; Staphylo অর্থ cluster) : এগুলো গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া এবং অনিয়মিত গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে, যা দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের থোকার ন্যায় দেখায়; উদাহরণ- *Staphylococcus aureus*.

(চ) সারসিনা (Sarcina) : এগুলো দেখতে গোলাকার। কক্কাস জাতীয় ব্যাক্টেরিয়াগুলো একত্রে সমান সমান দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় একটি ঘনতলের মতো গঠন তৈরি করে তখন তাকে সারসিনা বলে; উদাহরণ- *Sarcina lutea*.

২। ব্যাসিলাস (Bacillus; L. bacillus অর্থ small rod, বহুবচনে ব্যাসিলি Pl. bacilli) : দণ্ডাকৃতির ব্যাক্টেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Clostridium botulinum, Pseudomonas tabaci* ইত্যাদি। ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া নিম্নলিখিত ধরনের—

- **মনোব্যাসিলাস** (Monobacillus) : যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া এককভাবে থাকে তখন তাকে মনোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Escherichia coli*.
- **ডিপ্লোব্যাসিলাস** (Diplobacillus) : দুটি ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত অবস্থায় থাকলে তাকে ডিপ্লোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ— *Moraxella lacunata*.

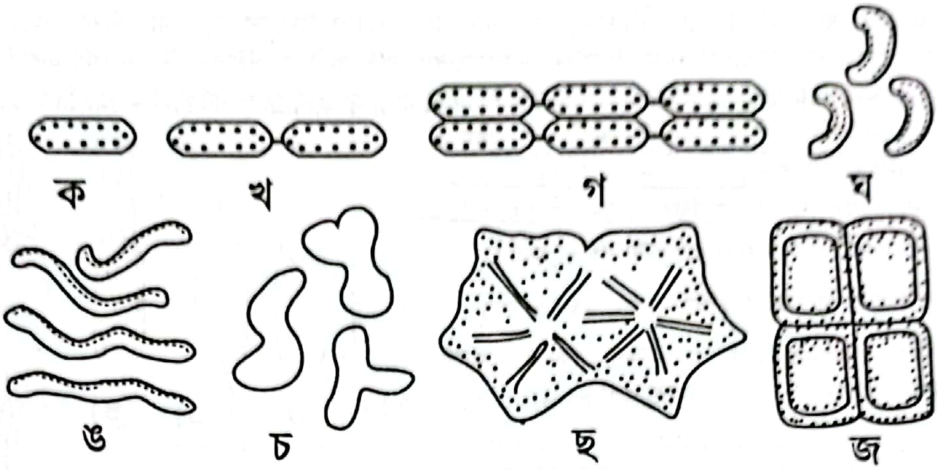

চিত্র ৪.৯ : (ক) মনোব্যাসিলাস, (খ) ডিপ্লোব্যাসিলাস, (গ) স্ট্রেপটোব্যাসিলাস. (ঘ) কমাকৃতি, (ঙ) স্পাইরিলাম, (চ) বহুরূপি, (ছ) তারকাকার এবং (জ) বর্গাকৃতির।

- **স্ট্রেপটোব্যাসিলাস (Streptobacillus) :** দুইয়ের অধিক ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত হয়ে লম্বা সূত্রাকার গঠন তৈরি করে তখন তাকে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Streptobacillus moniliformis.*
- **কক্কোব্যাসিলাস (Coccobacillus) :** যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো সামান্য লম্বা বা কতকটা ডিম্বাকার হয় তখন তাকে কক্কোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Salmonella, Mycobacterium.*
- **প্যালিসেড ব্যাসিলাস (Palisade bacillus) :** কখনো কখনো ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে অলীক টিস্যুর ন্যায় গঠন তৈরি করে তখন তাকে প্যালিসেড ব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Lampropedia* sp.

৩। **কমাকৃতি বা ভিব্রিও (Comma or Vibrio) :** যেসব ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি সাধারণত কমা চিহ্নের ন্যায় তাদের কমা ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদাহরণ- *Vibrio cholerae.*

৪। **স্পাইরিলাম (Spirillum;** L-spirillum অর্থ a small coil or twist, বহুবচনে স্পাইরিলা Pl. spirilla বা সর্পিলাকার) : প্যাঁচানো বা সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে; উদাহরণ- *Spirillum minus.*

৫। **বহুরূপি (Pleomorphic) :** সুনির্দিষ্ট আকারবিহীন ব্যাকটেরিয়াকে বহুরূপি ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদা. *Rhizobium* sp.

৬। **স্টিলেট বা তারকাকার (Stellate or Star shaped) :** এরা দেখতে অনেকটা তারকার ন্যায়; যেমন-*Stella* sp.

৭। **বর্গাকৃতির (Square shaped) :** চার বাহুবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকেই বর্গাকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; যেমন- *Haloquadratum walsbyi.*

৮। **ফিলামেন্টাস (Filamentus) :** এদের গঠন যখন সূত্রাকার হয় তখন তাকে ফিলামেন্টাস বলে; যেমন– *Candidatus savagella*।

(খ) রঞ্জনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (সিলেবাস বহির্ভূত কিন্তু জানা জরুরি)

১৮৮৪ সালে ড্যানিশ চিকিৎসক Hans Christian Gram ব্যাকটেরিয়ার জন্য একটি রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাকে বলা হয় Gram staining বা গ্রাম রঞ্জন পদ্ধতি।

স্লাইডে ব্যাকটেরিয়া স্মিয়ার (Smear) নিয়ে তাতে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং দিতে হবে, এরপর আয়োডিন দিতে হবে। এরপর এটি অ্যালকোহলে ধুয়ে স্যাফ্রানিন-এর লাল রং-এ কাউন্টার স্টেইন করতে হবে। যেসব ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে ব্লু থেকে পারপল হবে); যেমন-*Bacillus subtilis*. যেসব ব্যাকটেরিয়াতে ভায়োলেট রং ধুয়ে চলে যাবে এবং স্যাফ্রানিনের লাল রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে পিঙ্ক থেকে লাল হবে); যেমন-*Salmonella typhi*.

চিকিৎসাক্ষেত্রে গ্রাম স্টেইনিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেনিসিলিন বা পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, ফলে নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। আবার টেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন জাতীয় ওষুধ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়, তাই নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। এভাবে রোগী আরোগ্য হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, ক্লসট্রিডিয়াম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রাম পজিটিভ। এনটেরোব্যাকটেরিয়া, সকল সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শিগেলা, সালমোনেলা, রাইজোবিয়াম, ভিব্রিও, ই. কোলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ।

আমাদের নিজস্ব গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে বহু গাছপালা আছে যাদের নির্যাস গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে এসব উদ্ভিদ নির্যাস ব্যবহার করা যায়। *Polygonum lapathifolium* এমন একটি আগাছা। একে হার্বাল অ্যান্টিবায়োটিক বলতে পারি। প্রয়োজন ছাড়া কোনো একটি আগাছাও যেন আমরা নষ্ট না করি।

(গ) ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়)

১। অ্যাট্রিকাস (atrichous) : এদের কোষে কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না; উদাহরণ-*Corynebacterium diptheriae*.

২। মনোট্রিকাস (monotrichous) : এদের কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Vibrio cholerae*.

৩। অ্যাম্ফিট্রিকাস (amphitrichous) : এদের কোষের দুই প্রান্তে একটি করে ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Spirillum minus*।

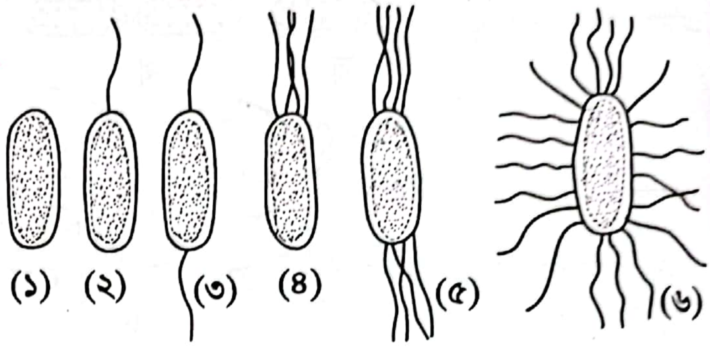

চিত্র ৪.১০ : ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ।
(১) অ্যাট্রিকাস (২) মনোট্রিকাস (৩) অ্যাম্ফিট্রিকাস
(৪) সেফালোট্রিকাস (৫) লফোট্রিকাস (৬) পেরিট্রিকাস।

৪। সেফালোট্রিকাস (cephalotrichous) : এদের কোষের এক প্রান্তে একগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে ; যেমন-*Pseudomonas fluorescens*।

৫। লফোট্রিকাস (lophotrichous) : এদের কোষের দু'প্রান্তে দু'গুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন-*Spirillum volutans*।

৬। পেরিট্রিকাস (peritrichous) : এদের দেহের সবদিকেই ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন- *Salmonella typhi*।

একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন (Structure of a Typical Bacterium)

ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে, এদের কোষীয় গঠন বৈশিষ্ট্যেও তেমনই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

MENINGES
Academic And Admission Care

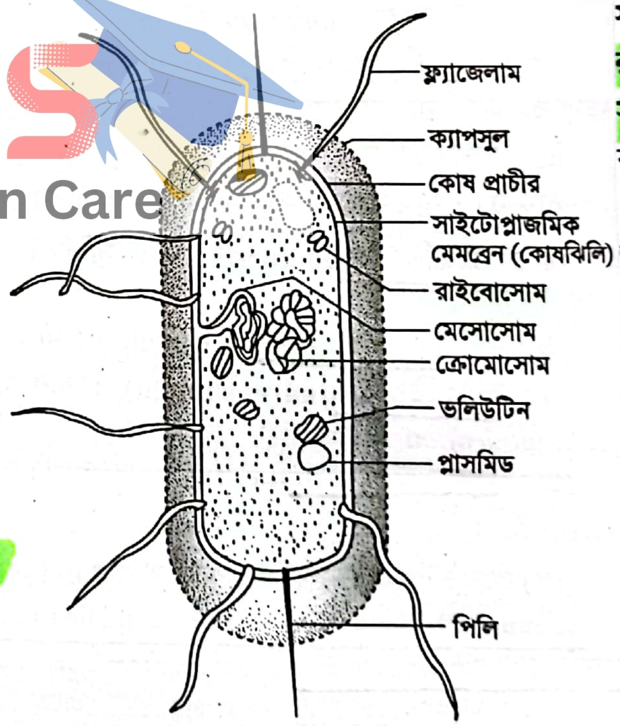

চিত্র ৪.১১ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ (আংশিক ছেদিত দৃশ্য)।

১। কোষ প্রাচীর : প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান মিউকোপ্রোটিন/মিউকোপেপটাইড জাতীয় যাকে মিউরিন/পেপটিডোগ্লাইকান বলে। পেপটিডোগ্লাইকান একটি কার্বোহাইড্রেট পলিমার। পেপটিডোগ্লাইকানের সাথে কিছু পরিমাণ মুরামিক অ্যাসিড এবং টিকোয়িক অ্যাসিডও থাকে। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি বেশ পুরু থাকে যা ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি পাতলা থাকে এবং এর ওপর ফসফোলিপিড/লিপোপলিস্যাকারাইড-এর একটি পাতলা স্তর থাকে। এজন্য এরা ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে না। মাইকোপ্লাজমাতে জড় প্রাচীর নেই বললেই চলে। এরা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া। লাইসোজাইম এনজাইম দ্বারা এর কোষ প্রাচীর বিগলিত হয়।

২। ক্যাপসুল : বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কার্বোহাইড্রেট (পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইড) দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসুল বলে। একে স্লাইম স্তরও বলা হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

CamScanner

৩। **ফ্ল্যাজেলা :** অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা নলাকার রডবিশেষ। ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যাজেলা গঠিত। প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের তিনটি অংশ থাকে। যথা– (i) সূত্র (ii) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (iii) ব্যাসাল বডি। ব্যাসাল বডি ফ্ল্যাজেলামকে কোষের প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত রাখে। ফ্ল্যাজেলা ব্যাকটেরিয়ার চলনে অংশগ্রহণ করে।

৪। **পিলি :** কতগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংখ্যায় অধিক, লোম সদৃশ অঙ্গ থাকে যাকে পিলি বলে। পিলি, পিলিন (Pilin) নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি। পোষক কোষের সাথে সংযুক্তির কাজ করে থাকে পিলি। গনোরিয়া ব্যাকটেরিয়া পিলি দ্বারা পোষক কোষের সাথে সংযুক্ত হয়।

৫। **প্লাজমামেমব্রেন :** সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। এটি সরল শৃঙ্খলের ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হিসেবে অবস্থিত, এর সাথে মাঝে মাঝে লিপোপ্রোটিন থাকে। এতে কোলেস্টেরল থাকে না। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন বহু শ্বসনিক ও ফসফোরাইলেটিক এনজাইম ধারণ করে (মাইটোকন্ড্রিয়ার অনুরূপ)। ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাইলাকয়েড সদৃশ গঠন সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়াতে মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, তবুও কিছু ATP তৈরি হয় সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায়, কারণ ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেনে ফসফোরাইলেটিক এনজাইম থাকে।

৬। **মেসোসোম :** ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে মেসোসোম বলে। অনেকের মতে মেসোসোম কোষ বিভাজনে সাহায্য করে থাকে।

৭। **সাইটোপ্লাজম :** সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোটো ছোটো কোষগহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ (লৌহ, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি)। গহ্বরগুলো কোষরস দিয়ে পূর্ণ থাকে। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণু হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। ক্রোম্যাটোফোর সাধারণত থাকে না, তবে সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্রোম্যাটোফোর থাকে। তরুণ ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে ভলিউটিন থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এসব দানা কোষগহ্বরে স্থানান্তরিত হয়। এগুলো খাদ্য সঞ্চয় করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

৮। **ক্রোমোসোম :** কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু। এটি কার্যত বৃত্তাকার এবং নগ্ন অর্থাৎ এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন প্রোটিন থাকে না। ক্রোমোসোমকে ঘিরে কোনো নিউক্লিয়ার আবরণ থাকে না, সাইটোপ্লাজমস্থ DNA সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিউক্লিওয়েড (nucleoid)/সিউডোনিউক্লিয়াস বলে।

৯। **প্লাসমিড :** বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকায় ও প্রকৃত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যাকে বলা হয় **প্লাসমিড**। প্লাসমিড স্ববিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এতে স্বল্পসংখ্যক জিন থাকে। জীবপ্রযুক্তিতে **ট্রান্সজেনিক** ব্যাকটেরিয়া বা জীব সৃষ্টিতে **ভেক্টর** হিসেবে প্লাসমিড ব্যবহৃত হয়।

ফ্ল্যাজেলা ও পিলির মধ্যে পার্থক্য

ফ্ল্যাজেলা	পিলি
১. কোষপ্রাচীরে ভেতরের পাদদেশীয় গ্র্যানিউল থেকে সৃষ্টি হয়।	১. কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে সৃষ্টি হয়।
২. সূত্রাকার লম্বা অঙ্গবিশেষ।	২. খাটো, ফাঁপা, দণ্ডাকার, শক্ত অঙ্গবিশেষ।
৩. ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।	৩. পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
৪. ব্যাক্টেরিয়ার কোষে এদের সংখ্যা কম থাকে।	৪. এদের সংখ্যা বেশি থাকে।
৫. ফ্ল্যাজেলা চলনে সাহায্য করে।	৫. পিলি পোষকদেহে সংযুক্তিতে সহায়তা করে।

কাজ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ অঙ্কন করো এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria) : ব্যাকটেরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হলো দ্বি-ভাজন পদ্ধতি। এটি একটি অযৌন পদ্ধতি। কুঁড়ি তথা মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে পারে। কুঁড়ি সৃ পদ্ধতিকে অঙ্গজ জনন পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

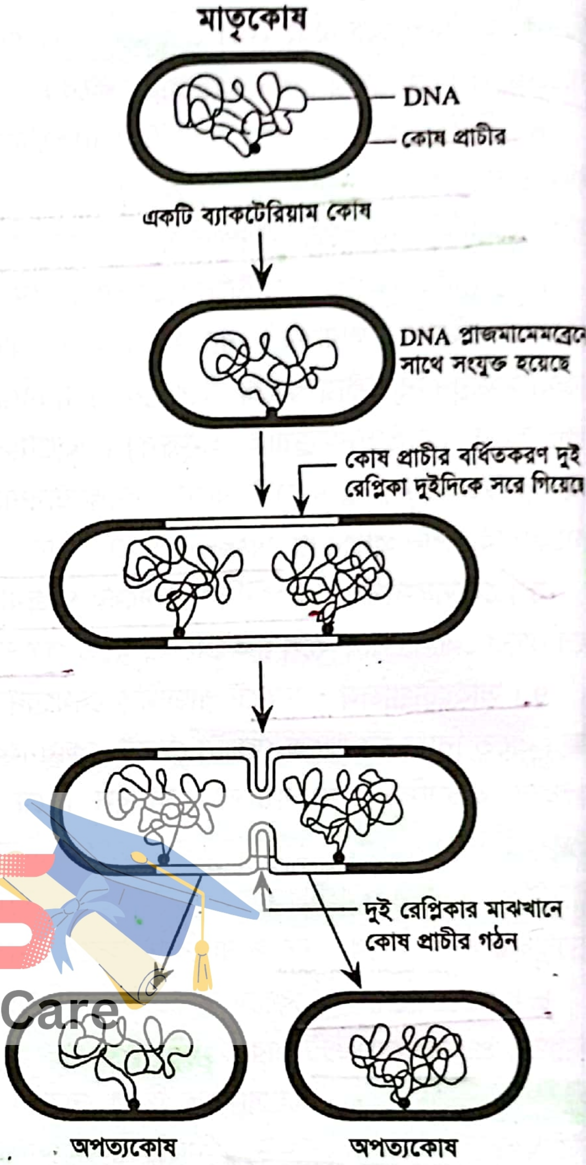

চিত্র ৪.১২ : দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি

□ **দ্বি-ভাজন (Binary fission) :** একটি কোষ সমান দু ভাগে ভাগ হওয়ার নাম দ্বি-ভাজন। অন্যভাবে বলা যায় দ্বি-ভাজন হলো আদিকোষের অযৌন জনন প্রক্রিয়া যেখানে নিউক্লিয়ার বস্তু (DNA) সমান দু ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বি-ভাজন পদ্ধতিই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি তথা প্রজননের প্রধান উপায়। এ প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ বিভক্ত হয়ে সমআকারের দুটিতে পরিণত হয় এবং এভাবেই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হয়।

১। ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম তথা DNA ব্যাকটেরিয়া কোষের দু প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থান নেয় এবং প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত হয়।

২। প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় DNA-অণুর রেপ্লিকেশন হয়।

৩। এ অবস্থায় কোষটি লম্বায় বৃদ্ধি পায়। কোষপ্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেনের বৃদ্ধি কোষের দু প্রান্তের মাঝখানে ঘটে থাকে।

৪। কোষপ্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন লম্বায় বৃদ্ধির কারণে DNA রেপ্লিকা দুটি দু দিকে পৃথক হয়ে যায়।

৫। লম্বায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষের মাঝখানে প্লাজমামেমব্রেন ক্রমশ ভেতরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং একই সাথে এ অংশে কোষপ্রাচীর সংশ্লেষিত হতে থাকে। এক সময় একটি কোষ, দুটি কোষে পরিণত হয়।

৬। শেষ পর্যায়ে টার্গার প্রেসারের কারণে নতুন সৃষ্ট অপত্যকোষ দুটি পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায়।

৭। পৃথক অপত্যকোষ দুটি বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের সমান আকারের হয় এবং পুনরায় দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

MENINGES Academic And Admission Care

পরিবেশ উপযুক্ত হলে আমাদের অন্ত্রের *E. coli* ব্যাকটেরিয়া প্রতি বিশ মিনিটে সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এক দি *E. coli*-এর ৭২টি জেনারেশন সৃষ্টি হতে পারে (৪.৭ সেক্সট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, যার ওজন এক লক্ষ পাউন্ড)। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, কারণ কয়ে জেনারেশন বৃদ্ধির পরই এদের খাবার ঘাটতি দেখা দেয় এবং এদের বর্জ্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে ফেলে, তাই দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যা সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে পোষক দেহের ইমিউন সিস্টেম দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার অব্যাহত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রয়োগকৃত ওষু দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারে, ফলে রোগ আরোগ্য হয়।

কাজ : মাতৃকোষ থেকে নতুন দুটি কোষ সৃষ্টির ধাপসমূহ নিজ ভাষায় বর্ণনা করো।

কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অনুকূল পরিবেশে মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে।

□ **মুকুলোদগম (Budding) :** (i) কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে মুকুলোদগম তথা কুঁড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে এক পাশে একটি ছোটো কুঁড়ি বের হয়। (ii) পরে একদিকে কুঁড়িটি ধীরে ধীরে বড়ো হয় এবং অপর দিকে মূল ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিওয়েড বস্তুটি দু খণ্ডে বিভক্ত হয়। (iii) নিউক্লিওয়েড বস্তুর একটি খণ্ড মুকুলে প্রবেশ করে। (iv) মুকুলটি মাতৃকোষের প্রায় সমান হলে পৃথক হয়ে যায়।

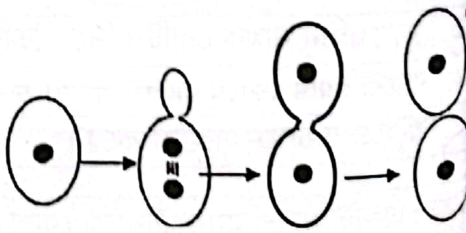

চিত্র ৪.১৩ : ব্যাকটেরিয়ার মুকুলোদগম।

CamScanner

☐ অযৌন জনন (Asexual reproduction) : প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া গনিডিয়া বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এ পদ্ধতিকে অযৌন জনন পদ্ধতি বলা হয়।

(i) গনিডিয়া : *Leucothris* জাতীয় সূত্রাকার ব্যাকটেরিয়ার অগ্রভাগ হতে গনিডিয়া নামক অযৌন একক সৃষ্টি হয় যা একসময় পৃথক হয়ে যায় এবং অনুকূল পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

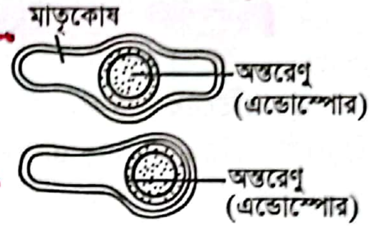

চিত্র ৪.১৪ : ব্যাক্টেরিয়ার অন্তরেণু।

(ii) এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু উৎপাদন : সাধারণত Bacillaceae গোত্রের ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে উৎপন্ন স্পোরই এন্ডোস্পোর। একটি ব্যাক্টেরিয়াম হতে একটি অন্তরেণু উৎপন্ন হয় তাই এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে না, প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মাত্র। অন্তরেণু গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং অত্যন্ত পুরু প্রাচীরে আবৃত থাকে। অনুকূল পরিবেশে অন্তরেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি মাত্র ব্যাক্টেরিয়া কোষ সৃষ্টি করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জনন প্রক্রিয়া নয়।

☐ যৌন জনন (Sexual reproduction) : প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াতে কোনো যৌন জনন ঘটে না। এখানে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না, কোনো মায়োসিস বিভাজন হয় না, কোনো ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় না, কোনো জাইগোটও তৈরি হয় না। তবে বংশগতীয় বস্তু (genetic material) স্থানান্তর হয়। বংশগতীয় বস্তু (ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম বা DNA) তিনভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে।

(i) কনজুগেশন নালিপথে : একটি দাতা কোষ ও একটি গ্রহীতা কোষের মধ্যে একটি ফাঁপা নলের মতো কনজুগেশন নালি সৃষ্টি হয়। এ নালিপথে দাতা কোষ থেকে সাধারণত প্লাসমিড গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্লাসমিড রেপ্লিকেট করে দুটি হয়, একটি দাতা কোষে থেকে যায়, অপরটি নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। বহু ব্যাকটেরিয়া এভাবে প্রচলিত ওষুধের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে পড়ে।

MENINGES
Academic And Admission Care

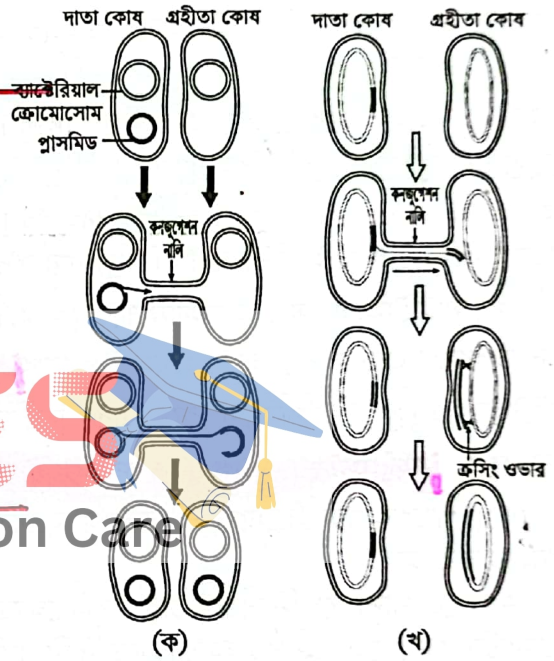

চিত্র ৪.১৫ : ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় বস্তুর স্থানান্তর (ক) প্লাসমিড স্থানান্তর, (খ) মূল ক্রোমোসোমের আংশিক স্থানান্তর ও রিকম্বিনেশন।

অতি বিরল ক্ষেত্রে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমও এ নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হতে পারে। সাধারণত ক্রোমোসোমের কিয়দংশ গ্রহীতা কোষে প্রবেশের পর নালির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রহীতা কোষের ক্রোমোসোমের সাথে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমের রিকম্বিনেশন ঘটে। অতিরিক্ত অংশ বিগলিত হয়ে যায়। গবেষণাগারে এটা ঘটানো সম্ভব হলেও প্রকৃতিতে খুবই কম ঘটে থাকে।

(ii) পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার (সাধারণত মৃত ব্যাকটেরিয়ার) DNA গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে **ট্রান্সফরমেশন** (Transformation)।

(iii) ফায ভাইরাসের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়ার জিনোম, কখনো ফায জিনোম, অন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে **ট্রান্সডাকশন** (Transduction)। ১৯৫২ সালে Zinder ও Lenderberg নামক দু'জন বিজ্ঞানী *Salmonella* ব্যাকটেরিয়াতে এ প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

উল্লেখ্য যে, Joshua Lederberg এবং Edward Tatum বিজ্ঞানীদ্বয় 1958 সালে *Escherichia coli* নামক ব্যাক্টেরিয়ার যৌন প্রবণতা আবিষ্কার করার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Bacteria) : ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার এবং অপকার দুই-ই করে থাকে। উভয় গুণাবলির জন্য ব্যাকটেরিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

(ক) চিকিৎসাক্ষেত্রে :

১। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন (*Bacillus subtilis* হতে), পলিমিক্সিন (*Bacillus polymyxa* হতে) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

২। প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি. (ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুষ্টংকার) রোগের টিকা বা প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। *Corynebacterium diptheriae* (D), *Bordetella pertussis* (P) এবং *Clostridium tetani* (T) হতে **DPT** (D= Diphtheria, P= Pertussis, T= Tetanus) নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে :

৩। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে : মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার অবদান অনেক। মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয়ে ব্যাকটেরিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। ব্যাকটেরিয়া মাটির উপাদান হিসেবেও কাজ করে। নানাবিধ আবর্জনা হতে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার ও জৈব গ্যাস প্রস্তুত করে থাকে।

৪। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : *Azotobacter, Pseudomonas, Clostridium* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগ পদার্থ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া সিমজাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে থাকে। বাংলাদেশে মসুর ডালের মূলে নডিউল তৈরি করে *Rhizobium* গণের তিনটি প্রজাতি। এগুলো হলো *R. bangladeshense, R. bine* এবং *R. lentis*। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর তরুণ বিজ্ঞানী ড. মো: হারুন-অর রশিদ এ নতুন ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কারক।

৫। নাইট্রিফিকেশন : অ্যামোনিয়াকে (NH_3) নাইট্রেট-এ (NO_3^-) পরিণত করাকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশন। সাধারণত দুটি উপধাপে এটি সম্পন্ন হয়। প্রথম উপধাপে *Nitrosomonas, Nitrococcus* ইত্যাদি স্থলজ ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইড-এ (NO_2^-) পরিণত করে এবং দ্বিতীয় উপধাপে *Nitrobacter* নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে (NO_3) পরিণত করে। এদেরকে নাইট্রিফাইং (nitrifying) ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। [$NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$]

৬। পতঙ্গনাশক হিসেবে : কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus thuringiensis*) বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

৭। পশু খাদ্য বা সিলেজ তৈরি : কৃষিক্ষেত্রে এবং দুগ্ধ শিল্পে পশুর অবদান উল্লেখযোগ্য। পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খড়জাতীয় পদার্থকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পানি মিশ্রিত করে *Lactobacillus* sp. এর কার্যকারিতায় পশুখাদ্য বা সিলেজ তৈরি হয়। Yeast মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে গাভীর দুধের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৮। ফলন বৃদ্ধিতে : কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং গমের উৎপাদন শতকরা ২০.৮ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

(গ) শিল্পক্ষেত্রে :

৯। চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে : চা, কফি, তামাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াজাতকরণে *Bacillus megaterium* নামক ব্যাকটেরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০। দুগ্ধজাত শিল্পে : *Streptococcus lactis, Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুগ্ধ হতে মাখন, দই, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

১১। পাট শিল্পে : ব্যাকটেরিয়ার পচনক্রিয়ার ফলেই পাটের আঁশগুলো পৃথক হয়ে যায় এবং আমরা সহজেই পাটের কাণ্ড থেকে আঁশ ছাড়াতে পারি। কাজেই আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা তুলনাহীন। এ ব্যাপারে *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট।

১২। চামড়া শিল্পে : চামড়া হতে লোম ছাড়ানোর ব্যাপারে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে *Bacillus* এর বিভিন্ন প্রজাতি চামড়ার লোম ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৩। বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস তৈরিতে : জৈব গ্যাস তৈরিতে এবং হেভী মেটাল (ভারী ধাতু) পৃথকীকরণেও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

১৪। **টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতিতে :** টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করতে এ সল্ট ব্যবহৃত হয়।

১৫। **রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকরণে :** ভিনেগার (*Acetobacter xylinum* দিয়ে), ল্যাকটিক অ্যাসিড (*Bacillus lacticacidi* দিয়ে), অ্যাসিটোন (*Clostridium acetobutylicum* দিয়ে) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের জন্য শিল্পক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) মানবজীবনে :

১৬। **সেলুলোজ হজমে :** গবাদি পশু ঘাস, খড় প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই পশুপালন সহজ হয়।

১৭। **ভিটামিন তৈরিতে :** মানুষের অন্ত্রের *Escherichia coli (E. coli)* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি$_2$, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

১৮। **জিন প্রকৌশলে :** জিন প্রকৌশলে অনেক ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli, Agrobacterium* প্রভৃতি) বাহক হিসেবে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়নে :

১৯। **আবর্জনা পচনে :** উদ্ভিদ ও প্রাণীর যাবতীয় মৃতদেহ, বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য জঞ্জাল পচন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বের জন্য ব্যাক্টেরিয়াকে **'প্রকৃতির ঝাড়ুদার'** বলে।

২০। **পয়ঃনিষ্কাশনে :** জৈব বর্জ্য পদার্থকে দ্রুত রূপান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া পয়ঃপ্রণালিকে সুষ্ঠু ও চালু রাখে; যেমন–*Zooglea ramigera*।

২১। **তেল অপসারণে :** সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল-খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়; যেমন–*Pseudomonas aeruginosa*।

২২। **বায়োগ্যাস উৎপাদন :** *Bacillus, E. coli, Clostridium, Methanococcus* ইত্যাদি বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা

১। **মানুষের রোগ সৃষ্টি :** মানুষের অধিকাংশ মারাত্মক রোগগুলোই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। মানুষের যক্ষ্মা (*Mycobacterium tuberculosis* দিয়ে), নিউমোনিয়া (*Diplococcus pneumoniae* দিয়ে), টাইফয়েড (*Salmonella typhi* দিয়ে), কলেরা (*Vibrio cholerae* দিয়ে), ডিপথেরিয়া (*Corynebacterium diptheriae* দিয়ে), আমাশয় (*Bacillus dysenteri* দিয়ে), ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস (*Clostridium tetani* দিয়ে), হুপিংকাশি (*Bordetella pertussis* দিয়ে) ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। এ ছাড়াও এনথ্রাক্স, মেনিনজাইটিস, লেপ্রসি (কুষ্ঠ রোগ), আনডিউলেটেড ফিভার ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Diseases = STD) : যেসব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগকে **যৌনবাহিত রোগ** বলে। যেমন- গনোরিয়া ও সিফিলিস। *Neisseria gonorrhoeae* প্রজাতিভুক্ত ব্যাক্টেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে **গনোরিয়া (Gonorrhea)** বলে। এতে গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। *Treponema pallidum* নামক ব্যাক্টেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে **সিফিলিস (Syphilis)** বলে। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মৃত্যুও হতে পারে।

২। **অন্যান্য প্রাণীর রোগ সৃষ্টি :** গরু-মহিষের যক্ষ্মা (*Mycobacterium bovis*), আনডিউলেটেড ফিভার, ভেড়ার এনথ্রাক্স (*Bacillus anthracis*), ইঁদুরের প্লেগ, হাঁস-মুরগির কলেরা (*Bacillus avisepticus*), গলাফোলা রোগ (*Pasteurella multocida*) ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

৩। **উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি :** বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদের অনেক রোগ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। এতে ফসলের ফলন অনেক কমে যায়। গমের টুন্ডুরোগ (*Agrobacterium tritici* দিয়ে), ধানের পাতা ধ্বসা (leaf blight) রোগ (*Xanthomonas oryzae* দিয়ে), আখের আঠাঝরা রোগ (*Xanthomonas vasculorum* দিয়ে) ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে।

CS CamScanner

এ ছাড়া লেবুর ক্যাংকার (*Xanthomonas citri*), আলুর স্ক্যাব (*Streptomyces scabies*), টমেটোর ক্যাঙ্কার (*Corynebacterium michiganese*), আপেলের ফায়ার ব্লাইট (*Erwinia amylovora*), তামাকের ব্লাইট (*Pseudomonas tabacci*), শিমের লিফ স্পট (*Xanthomonas malvacearum*) রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়।

৪। খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিষাক্তকরণ : ব্যাকটেরিয়া নানা রকম টাটকা ও সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে পচন ঘটিয়ে আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। *Clostridium botulinum* নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে botulin নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে যাকে বটুলিজম (botulism) বলে।

৫। পানি দূষণ : কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া (সাধারণত মল দিয়ে দূষিত) পানিকে পানের অযোগ্য করে।

৬। মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্টকরণ : নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কিন্তু কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus denitrificans*) নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় মাটিস্থ নাইট্রেটকে ভেঙে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।

৭। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষতি সাধন : ব্যাকটেরিয়া কাপড়-চোপড়, লোহা, কাঠের আসবাবপত্রসহ অনেক দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন-*Desulfovibrio* sp. লোহার পাইপে ক্ষতের সৃষ্টি করে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়।

৮। বায়োটেরোরিজম বা জৈব সন্ত্রাস : ক্ষতিকারক জীবাণুকে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে বায়োটেরোরিজম বলে।

৯। যানবাহনের দুর্ঘটনা : *Clostridium* sp. বিমানের জ্বালানিতে জন্মালে বিমান দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
১। প্রকৃতি	এরা অকোষীয়। এতে কোনো কোষীয় বস্তু নেই। RNA বা DNA আছে।	এরা কোষীয়। এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
২। আকার	এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার।	এরা আণুবীক্ষণিক, ০.২ হতে ৫.০ মাইক্রোমিটার।
৩। বংশবৃদ্ধি	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
৪। কেলাসিতকরণ (তরল দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা)	কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
৫। ক্ষুদ্রাঙ্গের উপস্থিতি	এতে সাইটোপ্লাজম ও কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই এবং বিপাক ক্রিয়াও দেখা যায় না।	এতে সাইটোপ্লাজম ও রাইবোসোম নামক ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে এবং বিপাক ক্রিয়া ঘটে।
৬। নিউক্লিক অ্যাসিডের অবস্থান	ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে।	ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।
৭। নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতি/ধরন	কোষে DNA বা RNA যে কোনো একপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	কোষে DNA এবং RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।
৮। এনজাইমের উপস্থিতি	এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

MENINGES
Academic And Admission Care

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মানুষ, পশু এবং গাছপালার অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতিপয় রোগ ফসল ও মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে, দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্ভিদে সাধারণত ব্লাইট, উইল্ট, গল ও রট (blight, wilt, gall, rot) রোগ হয়ে থাকে। এখানে ব্যাকটেরিয়াজনিত ধানের ব্লাইট রোগ এবং মানুষের কলেরা রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ব্লাইট (Blight) : গাছের ফুল, পাতা ও কাণ্ডের টিস্যুর ক্ষয়প্রাপ্তি (মরে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া) হওয়াকে ব্লাইট বলা হয়। এখানে ধান গাছের ব্লাইট (ধ্বসা) রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

CS CamScanner

(ক) ধান গাছের ব্লাইট রোগ (Blight disease of rice) : ধানের মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপীই এর বিস্তৃতি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণটি (strain) শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। জাপানের কৃষকেরা সর্বপ্রথম এ রোগের সন্ধান পান বলে ধারণা করা হয়। Takaeshi ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়।

রোগজীবাণু (Pathogen/Causal organism) : ধান গাছের ব্যাকটেরিয়্যাল ব্লাইট নামক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishsyama) Swings *et al.* এটি দণ্ডাকৃতির, ১.২ × ০.৩ - ০.৫ µm, অপেক্ষাকৃত মোটা ও খাটো। এরা সাধারণত এককভাবে থাকে, কখনো দুটি এক সাথে থাকতে পারে, তবে চেইন সৃষ্টি করে না। এরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং স্পোর তৈরি করে না। এদের কোনো ক্যাপসুল নেই, তবে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। অ্যাগার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, মসৃণ, মোমের ন্যায় হলুদাভ ও চকচকে কলোনি উৎপন্ন করে। এরা বিভিন্ন ঘাস (*Leersia oryzoides*., *Leptochloa dubia*. *Cyperus rotundus*, *C. difformis*) ও বন্য ধানকে (*Oryza rufipogon*, *O. australiensis*) বিকল্প পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

রোগাক্রমণ (Infection) : একাধিক উৎস থেকে রোগাক্রমণ ঘটতে পারে; যেমন– রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড়, জমিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। পাতার ক্ষত স্থান, কাটা স্থান (লাগানোর আগে অনেক সময় চারার লম্বা পাতার আগা কেটে দেয়া হয়), হাইডাথোড বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে জীবাণু গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। পরে জীবাণু শিরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছ নেতিয়ে পড়ে। **অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা (২৫–৩০° সে.), উচ্চ জলীয় বাষ্প, বৃষ্টি, জমিতে অধিক পানি** রোগাক্রমণে সহায়তা করে। অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগও রোগ বিস্তারের অনুকূল হয়। ঝড়ো বাতাস পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে, আর ঐ ক্ষত স্থান দিয়ে রোগজীবাণু ভেতরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে।

রোগ লক্ষণ (Sign and Symptoms) : সাধারণত রোগ লক্ষণ পাতায়ই সীমিত থাকে। লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

১। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়।
২। পাতায় ভেজা (Water-soaked), অর্ধস্বচ্ছ ও লম্বা লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগ পাতার শীর্ষে শুরু হয়।
৩। দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড়ো হতে থাকে এবং ঢেউ খেলানো প্রান্তবিশিষ্ট হয়।
৪। দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা ধূসর বর্ণের হয়।
৫। সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।
৬। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।
৭। আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মরে যায়।
৮। লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।
৯। ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
১০। ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।
১১। আক্রান্ত গাছের অধিকাংশ ধান চিটায় পরিণত হয়।*

রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ

১। সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা।
২। বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।
৩। কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।

* মানুষের চোখের জলে এক প্রকার এনজাইম থাকে যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং চোখকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

৪। জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে।

৫। বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে, অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।

৬। বীজ বুনা বা চারা লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে, পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৭। রোপণের সময় চারাগাছের পাতা ছাঁটাই করা যাবে না।

৮। নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

৯। গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টরপ্রতি ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

১০। ফিনাইল সারফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।

১১। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

(খ) কলেরা (Cholera)

রোগজীবাণু : *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি একটু বাঁকা, কমার মতো। এর দৈর্ঘ্য ১-৫ মাইক্রন এবং প্রস্থ ০.৪–০.৬ মাইক্রন। এর একপ্রান্তে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। কলেরা একটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। রবার্ট কক সর্বপ্রথম কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কলেরা রোগের জীবাণু দেহে ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাসের সাথে লেগে যায় এবং কলেরাজেন (Choleragen) নামক টক্সিন মিশ্রিত করে। কলেরাজেন একটি এন্টারোটক্সিন। বিভিন্ন কলেরার মধ্যে এশিয়াটিক কলেরা সবচেয়ে মারাত্মক।

রোগ লক্ষণ : কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ হলো প্রবল উদরাময় (ডায়রিয়া)। পায়খানার প্রথম দিকে মল থাকে, পরে চালধোয়া পানির মতো নির্গত হয়। রোগীর দেহে জ্বর থাকে এবং বমি হতে পারে। নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ হয়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রক্ত প্রবাহ কমে মস্তিষ্কে O_2 এর ঘাটতি দেখা দেয় ও রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। দেহে মাংসপেশির সংকোচন (cramp) এ রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। বমি এবং ঘন ঘন পানির ন্যায় পায়খানার ফলে রোগীর দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে, একই কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা, খিঁচুনি দেখা দেয়, রক্তচাপ ও তাপমাত্রা কমে যায়, তাপমাত্রা 95–96° F-এ নেমে আসে। রোগের প্রচণ্ডতায় রোগীর চোখ বসে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়ে যায়। চামড়া কুঁচকে যায়। ব্যাপক পরিমাণে শরীর থেকে পানি ও ইলেকট্রোলাইট হারানোর ফলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগী মারা যেতে পারে। এছাড়া রক্তসংবহনতন্ত্র অচল হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

প্রতিকার : কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পানি ও লবণ সমন্বয়ের জন্য শিরায় সেলাইন দেয়া হলো উত্তম চিকিৎসা। সাথে ডাবের পানি ও **খাবার সেলাইন** ORS (Oral Rehydration Saline) দেয়া যেতে পারে। রোগী মুখে খাবার গ্রহণ করতে না পারলে জরুরিভিত্তিতে শিরার মাধ্যমে **আইভি ফ্লুইড** (intra-venous fluid) প্রয়োগ করতে হবে। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। মোট কথা রোগীর দেহে যেন পানিশূন্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ : কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ, তাই বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা করতে হবে। দূষিত পানি, বাসি খাবার, রাস্তার উন্মুক্ত খাবার ও পানীয় বর্জন করতে হবে। রোগীর ভেদ-বমি থেকে মাছির সাহায্যে গৌণ সংক্রমণ ঘটে, তাই খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে। রোগীর পরিধেয় কাপড়, বিছানা-পত্র পুকুর বা নদী নালায় না ধুয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকাতে হবে। সম্ভব হলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। কোনো এলাকায় কলেরা দেখা দিলে সবার কলেরা ভ্যাকসিন (টিকা) নিতে হবে। কলেরা রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের পানি ও কলেরা সেলাইন খাওয়াতে হবে যাতে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতি দ্রুত পূরণ হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

ব্যবহারিক : টক দই থেকে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্কন।

তত্ত্ব : কতিপয় ব্যাকটেরিয়ার জৈব ক্রিয়াকলাপের ফলে দুধ, দই-এ পরিণত হয়, তাই দই-এ প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

উপকরণ : কিছু পরিমাণ টক দই সাসপেনশন, অণুবীক্ষণযন্ত্র, কাচের পরিষ্কার শুকনো স্লাইড, পাতিত পানি (পরিস্রুত পানি), ড্রপার, নিডল, তুলি, স্যাফ্রানিন রং, স্পিরিট ল্যাম্প, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, একটি টেস্টটিউব।

কার্যপদ্ধতি : ১। প্রথমে একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে সামান্য পরিমাণ টক দই নিতে হবে এবং তাতে পরিমাণমতো পরিস্রুত পানি মিশিয়ে ভালোভাবে কিছুক্ষণ ঝাঁকাতে হবে।

২। এবার ফ্লাস্কটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রেখে হালকা গরম করতে হবে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য ১০–১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। ১০–১৫ মিনিট পর দেখা যাবে দই-এর ঘন অংশ তলানি হিসেবে নিচে জমা হয়েছে আর জলীয় অংশ ওপরে রয়েছে। জলীয় অংশটুকু একটি টেস্টটিউবে ঢেলে নিতে হবে। এ জলীয় অংশই ব্যাকটেরিয়ার নমুনা।

৩। টেস্টটিউব থেকে ড্রপার দিয়ে এক ড্রপ নমুনা একটি পরিষ্কার স্লাইডের মাঝখানে রাখতে হবে এবং নিডলের সাহায্যে তরল নমুনাটুকু স্লাইডে ছড়িয়ে দিতে হবে।

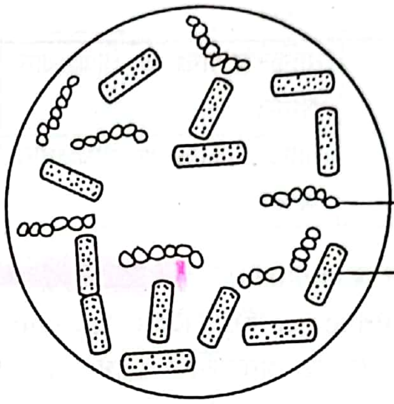

চিত্র ৪.১৬ : অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট টক দই-এ ব্যাকটেরিয়া।

৪। নমুনাটুকু বাতাসে শুকিয়ে গেলে স্লাইডকে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনের ওপর দিয়ে কয়েকবার আনা-নেওয়া করলে নমুনার আস্তরটি স্লাইডের সাথে ভালোভাবে লেগে যাবে।

৫। এবার স্লাইডের ওপর শুকনা নমুনাতে স্যাফ্রানিন দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং ২/৩ মিনিট পর হালকা করে পরিষ্কার পানি ঢেলে দিলে অতিরিক্ত রং পানির সাথে চলে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে স্লাইডটি শুকিয়ে যাবে। স্লাইডটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

MENINGES Academic And Admission Care

পর্যবেক্ষণ : স্লাইডটি অণুবীক্ষণযন্ত্রের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অবজেক্টিভ-এর নিচে রেখে নিরীক্ষণ করলে লাল রং-এ রঞ্জিত দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষুদ্র পুঁতির মালার মতো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত : সরবরাহকৃত টক দই-এ গোলাকার *Streptococcus* ও দণ্ডাকার *Lactobacillus* ব্যাকটেরিয়া থাকে। (টক দই-এর ব্যাকটেরিয়া মানুষের জন্য উপকারী, অপকারী নয়। কাজেই টক দই খেতে অসুবিধা নেই।)

অঙ্কন : অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা দৃশ্যটি ব্যবহারিক খাতায় যথাযথভাবে আঁকতে হবে।

৪.৩ : ম্যালেরিয়ার পরজীবী (Malarial Parasite— *Plasmodium*)

ম্যালেরিয়া পরজীবীর শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান : [Levin *et al.* (1980) অনুসরণে]

Kingdom : Protista
Subkingdom : Protozoa
Phylum : Apicomplexa
Class : Sporozoa
Order : Haemosporidia
Family : Plasmodiidae
Genus : *Plasmodium*
Species : *Plasmodium vivax, P. ovale, P. falciparum, P. malariae*

প্রধান শব্দসমূহ :
সাইজোগনি, গ্যামিটোগনি, স্পোরোগনি, সুপ্তাবস্থা, জনুঃক্রম, সংক্রমণ

Plasmodium গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি ম্যালেরিয়ার পরজীবী নামে পরিচিত। প্রজাতিগুলো মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে (যেমন– সরীসৃপ, পাখি, বানর, ইঁদুর ইত্যাদি) পরজীবী হিসেবে জীবন চক্রের একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করে এবং ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। *Plasmodium* গণভুক্ত প্রায় ৬০টি প্রজাতির মধ্যে ৪টি প্রজাতি মানবদেহে ভিন্ন ভিন্ন

CamScanner

ধরনের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। নিচে ম্যালেরিয়ার পরজীবীগুলোর (মানুষে রোগ সৃষ্টিকারী) নাম, বিস্তৃতি, রোগের নাম এবং জ্বরের প্রকৃতি উল্লেখ করা হলো–

পরজীবীর নাম	বিস্তৃতি	রোগের নাম	জ্বরের প্রকৃতি
Plasmodium falciparum	গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া	৩৬–৪৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
Plasmodium ovale	গ্রীষ্মপ্রধান ও উপ-গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	মাইল্ড (মৃদু) টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া	৪৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
Plasmodium vivax	নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া	৪৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
Plasmodium malariae	নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া	৭২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে

ম্যালেরিয়া কী (What is malaria) ? : ম্যালেরিয়া হচ্ছে *Anopheles* মশকীবাহিত (পুরুষ মশা নয়) এক ধরনের জ্বর রোগ। Protista জগতের Protozoa উপজগতের Apicomplexa পর্বের *Plasmodium* গণভুক্ত প্রায় ৬০টি প্রজাতি দ্বারা মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে **ম্যালেরিয়া** রোগ হয়। এ রোগে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়, তাই রক্তস্বল্পতাসহ (anaemia) বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। **নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কাঁপুনিসহ জ্বর আসা এ রোগের প্রধান লক্ষণ।**

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর ভেক্টর (Vectors of Malarial Parasite in Bangladesh) : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১১৩টি প্রজাতির মশা শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে *Anopheles* গণভুক্ত ৭টি প্রজাতি ম্যালেরিয়ার পরজীবীর **ভেক্টর** (অর্থাৎ পরজীবী বহনকারী কোনো জীব) হিসেবে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। এরা হলো– *Anopheles dirus, A. philippinensis, A. sundaicus, A. minimus, A. annularis, A. vagus* ও *A. aconitus*। এদের মধ্যে প্রথম ৪টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়া আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (History of discovery of malaria) : ম্যালেরিয়া বিশ্বের প্রাচীনতম রোগগুলোর অন্যতম। খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের শুরুতে চীন দেশে এটি 'অনুপম পর্যাবৃত্ত জ্বর' (unique periodic fever) হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ম্যালেরিয়া রোগের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে একে **'রোমান জ্বর'** বলা হতো। মধ্যযুগে একে **'জলা জ্বর'** (marsh fever) বলা হতো। *Malaria* শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী **Torti** ১৭৫৩ সালে। দুটি ইটালীয় শব্দ *Mal* (অর্থ- দূষিত) ও *aria* (অর্থ- বায়ু) হতে Malaria শব্দের উৎপত্তি যার আভিধানিক অর্থ দূষিত বায়ু। প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল যে, "দূষিত বায়ু সেবনে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়।" ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সেনাবাহিনীর ডাক্তার **আলফোঁসে ল্যাভেরান** (Alphonse Laveran, 1845–1922) সর্বপ্রথম মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় পরজীবীর উপস্থিতি আবিষ্কার করেন এবং ম্যালেরিয়ার কারণ হিসেবে প্রোটোজোয়ানকে প্যাথোজেনিক এজেন্টরূপে প্রমাণ করেন। এজন্য ল্যাভেরানকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কর্মরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ডাক্তার **স্যার রোনাল্ড রস** (Sir Ronald Ross) আবিষ্কার করেন যে, *Anopheles* গণভুক্ত মশকীরা এ রোগের জীবাণু একদেহ থেকে অন্যদেহে বিস্তার ঘটায়। এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাঁকে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে **শর্ট** (Short) মানুষের যকৃত কোষে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির বর্ণনা দেন।

ব্রু সোয়াট (Brue Chwatt) ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। **ব্রে এবং গার্নহাম** (Bray and Garnham) ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর *Plasmodium* গণভুক্ত প্রজাতিগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করেন।

স্বভাব ও বাসস্থান : *Plasmodium* একধরনের **অন্তঃকোষীয় রক্তপরজীবী**। মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর যকৃত কোষ ও লোহিত রক্তকণিকায় এবং *Anopheles* মশকীর পৌষ্টিক নালি ও লালাগ্রন্থিতে এরা বাস করে।

CamScanner

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণসমূহ (Symptoms of Malaria) : ম্যালেরিয়ার পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই মানবদেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সংক্রমণের দু থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

১। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে—

(i) বমিবমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং খাবারে অনীহা দেখা দেয়।

(ii) মাথা ব্যথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, পেশির ব্যথা এবং শীত শীত ভাব অনুভূত হয়।

২। রোগের মাধ্যমিক পর্যায়ে—

(i) প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে।

(ii) জ্বর উচ্চ তাপমাত্রার হয় (104°–106°F পর্যন্ত)।

(iii) কয়েক ঘণ্টা পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

(iv) জ্বরের প্রকোপ সাধারণত পূর্বাহ্নে বা অপরাহ্নে হয়।

(v) জ্বর প্রতি ২–৩ দিন পরপর আসে।

(vi) ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়– (ক) শীত অবস্থা (২০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা স্থায়ী হয়), (খ) উত্তাপ অবস্থা (২–৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়) এবং (গ) ঘাম অবস্থা (২–৩ ঘণ্টা স্থায়ী হয়)।

৩। রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে—

(i) দীর্ঘদিন ধরে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর যকৃত (liver) ও প্লীহা (spleen) অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়। আক্রান্ত রোগীর প্লীহা থেকে লাইসোলেসিথিন (lysolecithin) নামক পদার্থ নিঃসৃত হয় যা অনেক স্বাভাবিক রক্তকণিকা ধ্বংস করে।

(ii) রোগীর খাদ্য পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে।

(iii) পরজীবী হিমোলাইসিন (haemolysin) নামক অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা লোহিত রক্তকণিকাগুলোকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস সাধন করে, ফলে দেহে মারাত্মক রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং রোগী দুর্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

MENINGES
Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়ার পরজীবীর (*Plasmodium vivax*) জীবনচক্র

কোনো জীবের জন্ম অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, বিকাশ, জনন ইত্যাদি পর্যায় অতিক্রম করে পুনরায় ঐ অবস্থার পুনর্জন্ম দেওয়ার চক্রীয় ধারাকে ঐ জীবের জীবনচক্র (life cycle) বলে। *Plasmodium vivax*-এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়; যথা– মানুষ ও মশকী।

☐ **মানুষ :** মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্তকণিকায় পরজীবীর **অযৌন জনন** বা **সাইজোগনি** ঘটে। পোষকের প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী মানুষ এ পরজীবীর **মাধ্যমিক পোষক** (intermediate host)।

☐ **মশকী :** *Anopheles* গণভুক্ত কয়েকটি প্রজাতির মশকীর দেহে পরজীবীর **যৌন জনন** বা **গ্যামিটোগনি** সম্পন্ন হয়। মশকী এ পরজীবীর **নির্দিষ্ট পোষক** (definitive host)।

বি. দ্র. (i) দুটি পোষক কেন প্রয়োজন?-নিম্নশ্রেণির জীবেরা বার বার অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের কারণে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাই তারা মাঝে মাঝে যৌন জননে আবদ্ধ হয়ে জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। এটি নিম্নশ্রেণির জীবদের Evolutionary অভিযোজন। *Plasmodium* এর জীবনেও এমনটি ঘটেছে। তাই তারা একটি পোষকের মাধ্যমে (যেহেতু যৌন জনন মশকীতে ও অযৌন জনন মানবদেহে) জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

(ii) কেবলমাত্র স্ত্রী *Anopheles* মশকী ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় কেন? স্ত্রী মশকীর ডিম্বাণুর পরিস্ফুটনের জন্য উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর রক্ত প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র মশকীরাই (মশা নয়) রক্ত পান করে এবং জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। পুরুষ মশারা ফুলের মধু বা অন্যান্য উৎস হতে খাবার সংগ্রহ করে মানুষকে দংশন করে না।

অপরদিকে *Culex* বা *Aedes* প্রভৃতি মশকীর পরিপাকতন্ত্রে বিশেষ ধরনের এনজাইম আছে, যা জীবাণুর গ্যামিটোসাইটগুলোকে নষ্ট করতে সক্ষম। তাই এরা এ জীবাণুর বিস্তার ঘটাতে পারে না। কিন্তু *Anopheles* এর দেহে এরূপ এনজাইম না থাকায় গ্যামিটোসাইটগুলো সক্রিয় থাকে ও রোগের বিস্তার ঘটায়।

CamScanner

ম্যালেরিয়ার পরজীবীর জীবনচক্রের ধাপসমূহ

- **মানবদেহে (অযৌন জনন)**
  - হেপাটিক সাইজোগনি (যকৃতে)
    - প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
      - ১। স্পোরোজয়েট
      - ২। ক্রিপ্টোজয়েট
      - ৩। সাইজন্ট
      - ৪। ক্রিপ্টোমেরোজয়েট
    - এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
      - ১। সাইজন্ট
      - ২। মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট
        - (i) মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট
        - (ii) ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট
  - এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (লোহিত রক্ত কণিকায়)
    - ১। ট্রোফোজয়েট
    - ২। সিগনেট রিং
    - ৩। অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েট
    - ৪। সাইজন্ট
    - ৫। রোজেট
    - ৬। মেরোজয়েট
    - ৭। গ্যামিটোসাইট
      - (i) মাইক্রোগ্যামিটোসাইট
      - (ii) ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট
- **মশকীর দেহে (যৌন জনন)**
  - গ্যামিটোগনি (ক্রপের ভেতরে)
    - ১। গ্যামিট সৃষ্টি
    - ২। নিষেক
    - ৩। জাইগোট
    - ৪। উওকিনেট
  - স্পোরোগনি (ক্রপের বহিঃপ্রাচীরে)
    - ১। উওসিস্ট
    - ২। স্পোরোজয়েট

MENINGES Academic And Admission Care

মানবদেহে জীবনচক্র

মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীবীর অযৌন জনন পদ্ধতিতে জীবনচক্র সম্পন্ন করে। এ জীবনচক্রে সাইজন্ট নামক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি বিশেষ দশা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের জীবনচক্রকে সাইজোগনি বলে। মানবদেহে সংঘটিত সাইজোগনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। **হেপাটিক সাইজোগনি বা যকৃত সাইজোগনি** এবং ২। **এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্তকণিকা সাইজোগনি**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১। হেপাটিক সাইজোগনি (Hepatic Schizogony) : মানুষের যকৃত কোষে সংঘটিত ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন জননকে **হেপাটিক সাইজোগনি** বলে। বিজ্ঞানী Shortt and Garnham (1948) মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্রের বর্ণনা দেন। হেপাটিক সাইজোগনি দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়–

(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Pre-erythrocytic Schizogony) : মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে (হেপাটোসাইটে) স্পোরোজয়েট থেকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনি বা অযৌন জননকে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। এ সময় একেকটি সাইজন্ট থেকে ৮০০০–২০০০০ মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়।

(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Exo-erythrocytic Schizogony) : মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট থেকে মাইক্রো ও ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনি বা অযৌন জননকে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।

(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি : *Anopheles* মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থিত *Plasmodium*-এর স্পোরোজয়েট দশাটি পরিণত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এ জাতীয় মশকীর দংশনের ফলে স্পোরোজয়েটগুলো রসের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis-কোনো রাসায়নিক উদ্দীপকের প্রভাবে কোনো জীব বা জনন কোষের চলন) এর কারণে যকৃতে এসে আশ্রয় নেয়। যকৃত সাইজোগনির এ পর্যায় অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ধাপগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

CamScanner

১। স্পোরোজয়েট-এর যকৃত কোষে প্রবেশ : স্পোরোজয়েটগুলো সঞ্চালনক্ষম, অতি ক্ষুদ্র (১০ μm–১৪ μm দৈর্ঘ্য ও ০.৫ μm–১ μm প্রস্থ), সামান্য বাঁকানো ও উভয় প্রান্ত সূঁচালো দেহবিশিষ্ট আক্রমণকারী দশা। এদের স্ফীত অংশের মাঝখানে একটি হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াস থাকে। স্পোরোজয়েট রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে যকৃতে চলে আসে এবং যকৃত কোষে তথা হেপাটোসাইটে প্রবেশ করে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্র শুরু করে।

২। ক্রিপ্টোজয়েট (Cryptozoite) : যকৃত কোষে প্রবেশের পর স্পোরোজয়েট খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করে। খাদ্য গ্রহণ করার পর এরা আকৃতিতে বড়ো হয় এবং মাকু আকৃতির স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিপ্টোজয়েটে পরিণত হয়।

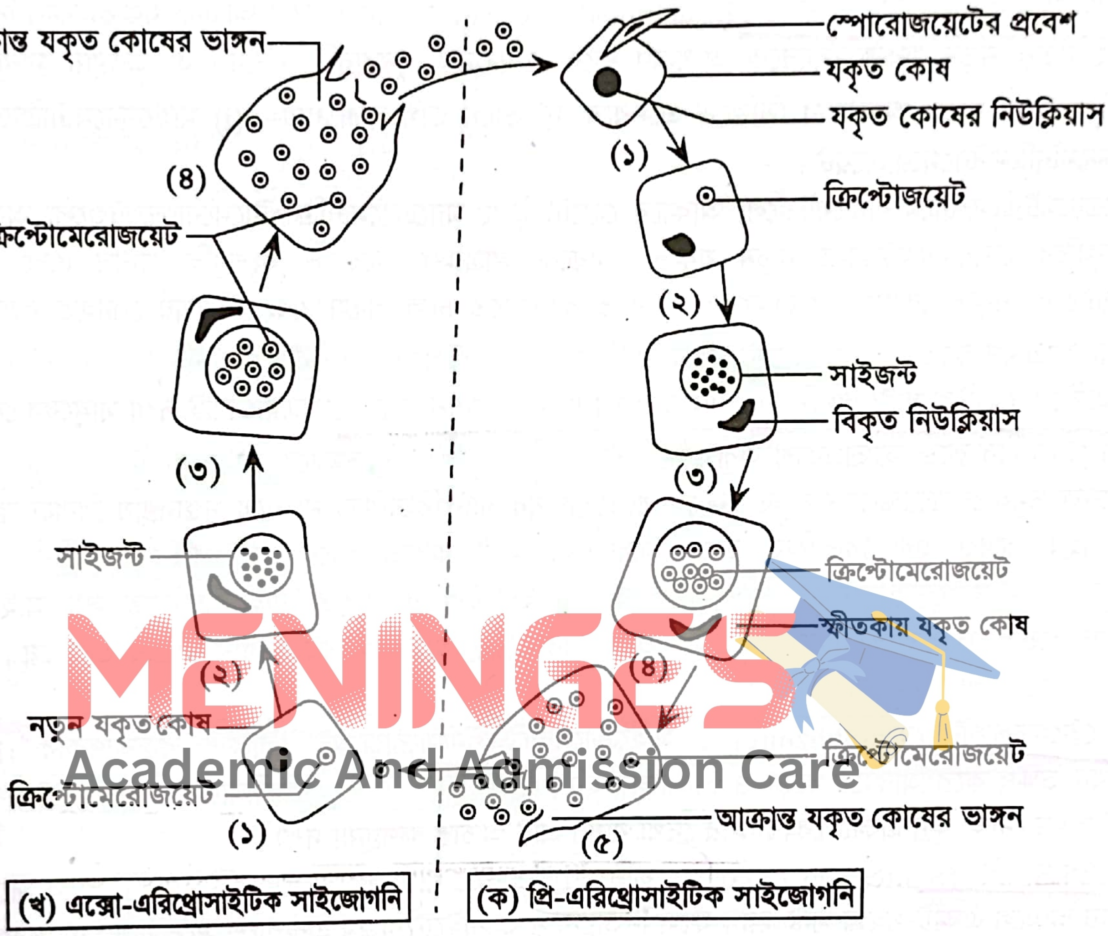

চিত্র ৪.১৭ : হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনি (স্থিতিকাল ৭–১০ দিন)।

MENINGES Academic And Admission Care

৩। সাইজন্ট (Schizont) : প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট (প্রজাতিভেদে পায় ১০০০–১২০০টি) দশায় পরিণত হয়। বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট পরজীবীর এ দশাকে **সাইজন্ট** বলে।

৪। ক্রিপ্টোমেরোজয়েট (Cryptomerozoite) : পরিণত সাইজন্টের অভ্যন্তরে উৎপন্ন প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে যে নতুন কোষের সৃষ্টি করে তাকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো সাইজন্ট ও যকৃত কোষের কোষঝিল্লি ভেঙ্গে বের হয়ে যকৃতের **সাইনুসয়েড** (Sinusoid; রক্তপূর্ণ উন্মুক্ত স্থান)-এ অবস্থান করে এবং এখান থেকে পরবর্তী চক্র শুরু করে।

মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে (হেপাটোসাইটে) স্পোরোজয়েট থেকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনি বা অযৌন জননকে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। একটি প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পূর্ণ হতে প্রায় ৪ দিন সময় লাগে। এ সময় এককেটি সাইজন্ট থেকে ৮০০০–২০০০০ মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়। এ সময় রোগীর দেহে রোগের কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না।

CS CamScanner

(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি : এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন্ন ক্রিপ্টোমেরোজয়েটও নতুন হেপাটোসাইটকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রের সূচনা করে।

২। সাইজন্ট : পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বারবার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পরিণত হয়।

৩। মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট : সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে সাইটোপ্লাজম জমা হয় এবং প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা আবৃত হয়ে যেসব নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাদেরকে মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে।

৪। আক্রান্ত যকৃত কোষের ভাঙ্গন : মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো পরিণত হলে আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে এবং নতুন নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এ চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ অবস্থায় মানুষের যকৃতে প্রচুর মেরোজয়েট পাওয়া যায়। আকারের ভিত্তিতে এদেরকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়– **(i) মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট** ও **(ii) ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট।**

মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো আকারে ছোটো এবং ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো আকারে বড়ো হয়। বড়ো আকৃতির মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে ও বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং ছোটো আকৃতির মেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষকে আক্রমণের পরিবর্তে রক্তস্রোতে চলে আসে এবং মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) প্রবেশ এবং আক্রমণ করে। স্পোরোজয়েট থেকে এ অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে পরজীবীর প্রায় ৭–১০ দিন সময় লাগে।

২। এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্তকণিকায় অযৌন চক্র : স্পোরোজয়েট দশা মানুষের দেহে প্রবেশের পর ম্যালেরিয়া পরজীবীর রক্তে আত্মপ্রকাশ করতে ৭–৮ দিন সময় লাগে। এ সময়কে **প্রি-প্যাটেন্ট কাল** (Pre-patent period) বলে। অনেক সময় স্পোরোজয়েট যকৃত কোষে প্রবেশের পর এটি বিভাজিত না হয়ে সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করে। দীর্ঘ কয়েক মাস বা বছর পরেও এরা বিভাজিত হয়ে মেরোজয়েট সৃষ্টি করতে পারে। ম্যালেরিয়া পরজীবীর এ ধরনের সুপ্ত স্পোরোজয়েটদের **হিপনোজয়েট** (hypnozoite) বলে। হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনিতে সৃষ্ট মাইক্রোমেটাক্রিপ্টো-মেরোজয়েট রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করার পর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রের শুরু হয়। এতে পর্যায়ক্রমে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো লক্ষ্য করা যায় :

MENINGES
Academic And Admission Care

১। ট্রোফোজয়েট (Trophozoite) : মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট লোহিত রক্তকণিকার (RBC) অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভক্ষণ করে আকারে বড়ো ও গোলাকার হয়। এক নিউক্লিয়াসযুক্ত পরজীবীর এ দশাকে **ট্রোফোজয়েট** বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষগহ্বর দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা।

২। সিগনেট রিং (Signet ring) : লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে খাদ্য গ্রহণ করে বৃদ্ধি লাভের সাথে সাথে ট্রোফোজয়েট-এর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়। ফলে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একপাশে সরে যায়। এ অবস্থায় পরজীবীটিকে একটি পাথর বসানো আংটির মতো মনে হয়। এ অবস্থাকে **সিগনেট রিং** বলে।

৩। অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েট (Amoeboid trophozoite) : প্রায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে পরজীবীর অন্তঃস্থ গহ্বরটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরজীবীটি ক্ষণপদবিশিষ্ট অ্যামিবার আকৃতি ধারণ করে। তাই একে **অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েট** বলে। ট্রোফোজয়েট হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন উপাদানকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং হিমাটিন বিষাক্ত **হিমোজয়েন** (haemozoin)-এ পরিণত হয়। এ সময় লোহিত কণিকাটি আকারে বড়ো হয় এবং এদের সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এ দানাগুলোকে **সাফনার্স দানা** (schuffner's dots) বলে। রক্তকণিকায় সাফনার্স দানার উপস্থিতি দেখে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।

৪। সাইজন্ট (Schizont) : অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েট-এর ক্ষণপদ ক্রমে বিলীন হয়ে যায় এবং পরজীবীটি গোলাকার রূপ ধারণ করে। অতঃপর এর নিউক্লিয়াস অযৌন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে ১২–২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এ রকম বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত পরজীবীকে **সাইজন্ট** বলে।

৫। মেরোজয়েট (Merozoite) : সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস প্রায় ৪৫ ঘণ্টা পর সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে ১২–১৮টি গোলাকার কোষে পরিণত হয়। এদেরকে **মেরোজয়েট** বলে। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় দু' স্তরে সজ্জিত হয়। পরজীবীর এ অবস্থাকে **রোজেট (rosette) দশা** বলে। মেরোজয়েটগুলো

CamScanner

লোহিত কণিকার আবরণ ভেঙ্গে প্লাজমায় মুক্ত হয় এবং নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করার মাধ্যমে একইভাবে চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। একটি সম্পূর্ণ এরিথ্রোসাইটিক চক্র সম্পন্ন করতে *Plasmodium vivax* এর ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রতিটি চক্রের শেষে অসংখ্য মেরোজয়েট প্লাজমায় মুক্ত হওয়ার কারণে আক্রান্তের দেহে কাঁপুনিসহ জ্বর আসে। মানুষের দেহে স্পোরোজয়েটের প্রবেশের পর থেকে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কালকে সুপ্তাবস্থা (incubation period) বলে।

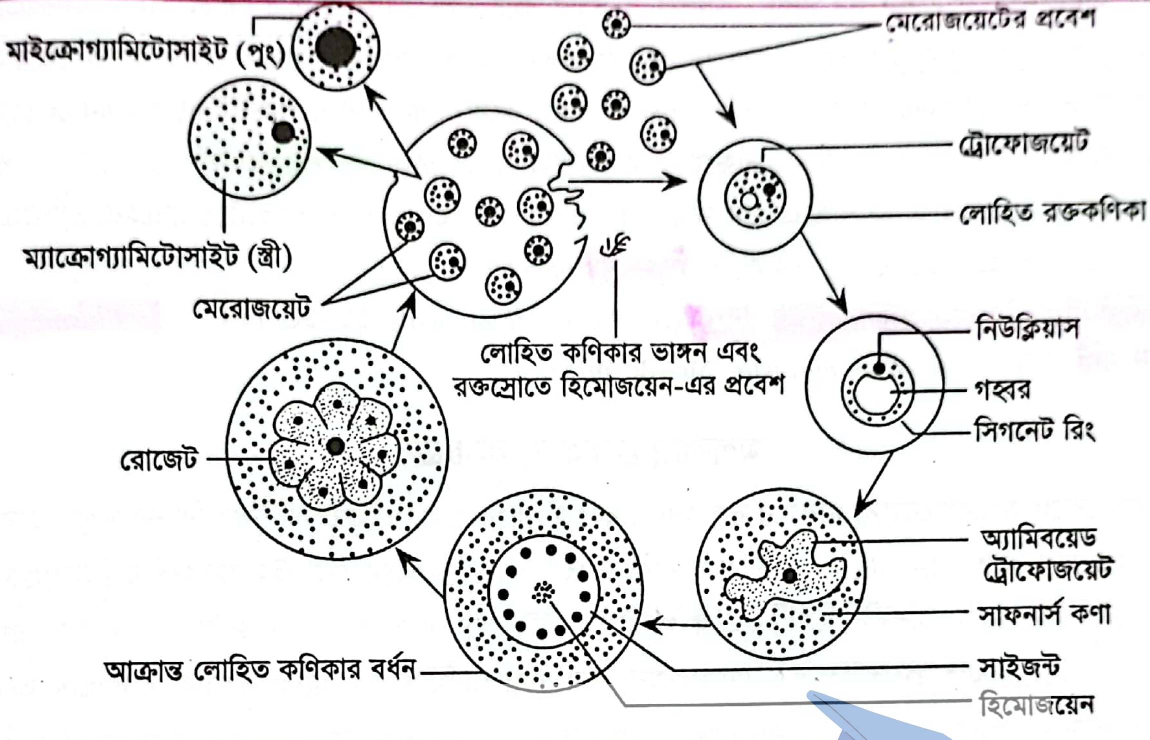

চিত্র ৪.১৮ : এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি।

MENINGES
Academic And Admission Care

৬। **গ্যামিটোসাইট গঠন (Formation of Gametocyte) :** এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন্ন কিছুসংখ্যক মেরোজয়েট, ট্রোফোজয়েট এবং সাইজন্টে পরিণত না হয়ে লোহিত রক্তকণিকার অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হয়ে গ্যামিটোসাইট গঠন করে। গ্যামিটোসাইট দু'প্রকার; যথা—

(ক) মাইক্রো/পুংগ্যামিটোসাইট : এরা ৯–১০ μm ব্যাসবিশিষ্ট, সাইটোপ্লাজম হালকা নীল বর্ণের হয়। কেন্দ্রস্থলে বড়ো গোলাপী বর্ণের নিউক্লিয়াস অবস্থিত।

(খ) ম্যাক্রো/ স্ত্রীগ্যামিটোসাইট : এরা ১০–১২ μm ব্যাসবিশিষ্ট, সাইটোপ্লাজম ঘন নীল বর্ণের হয়। নিউক্লিয়াস ছোটো, ঘন, প্রান্তভাগে অবস্থিত। পরিণত গ্যামিটোসাইট তৈরি হতে প্রায় ৯৬ ঘণ্টা সময় লাগে। লোহিত রক্তকণিকার অভ্যন্তরে গ্যামিটোসাইটগুলোর আর কোনো পরিবর্তন হয় না। পরবর্তীতে পরিস্ফুটনের জন্য এদেরকে স্ত্রী মশকীর দেহে প্রবেশ করতে হয়। ৭ দিনের মধ্যে মশকী কর্তৃক গৃহীত না হলে গ্যামিটোসাইটগুলো ধ্বংস হতে থাকে। অর্থাৎ মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইট ৭ দিনের বেশি বাঁচে না।

তুলনীয় বিষয়	হেপাটিক সাইজোগনি	এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
১. কোথায় ঘটে	মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	মানুষের লোহিত কণিকায় ঘটে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টো-মেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ পাওয়া যায়।	ট্রোফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখা যায়।
৩. হিমোজয়েন	উৎপন্ন হয় না।	শেষ দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।
৪. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	এ চক্র চলাকালে মানুষের জ্বর হয় না।	এ চক্র চলাকালে মানবদেহে কাঁপুনিসহ জ্বর হয়।
৫. সাফনার্স দানা	দেখা যায় না।	সাইজন্টের বাইরে সাফনার্স দানা পাওয়া যায়।
৬. জ্বর	জ্বর হয় না।	কাঁপুনিসহ জ্বর হয়।

CS CamScanner

সুপ্তাবস্থা (Incubation period)

মানবদেহে পরজীবী প্রবেশের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে রোগের সুপ্তাবস্থা বা সুপ্তিকা বলে। ম্যালেরিয়ার পরজীবী বহনকারী কোনো মশকী মানুষকে দংশন করলে সাথে সাথে জ্বর হয় না, দংশনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট মানবদেহে প্রবেশের পর যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। এ সময় মানুষের যকৃত কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যকৃত কোষ থেকে মেরোজয়েটগুলো লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং এখানেও বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। শেষ পর্যায়ে পরজীবীগুলো যখন লোহিত কণিকা প্রাচীর ভেঙ্গে রক্তরসে এসে পড়ে তখন মেরোজয়েটগুলোকে নষ্ট করার জন্য রক্তের শ্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন (Pyrogen) ক্ষরণ করে। বিষাক্ত এ পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে পরবর্তীতে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং জ্বর আসে। বিভিন্ন *Plasmadium* প্রজাতির সুপ্তাবস্থা নিম্নরূপ :

(i) *Plasmodium falciparum* ৮–১৫ দিন, (ii) *Plasmodium ovale* ১১–১৬ দিন, (iii) *Plasmodium vivax* ১২–২০ দিন এবং (iv) *Plasmodium malariae* ১৮–৪০ দিন।

মশকীর দেহে জীবনচক্র

ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কোনো মানুষের রক্ত মশকী কর্তৃক গৃহীত হলে গ্যামিটোসাইটসহ বিভিন্ন দশার জীবাণু মশকীর ক্রপের লুমেনে প্রবেশ করে। *Anopheles* ব্যতীত অন্যান্য মশকীর পরিপাকতন্ত্রের এনজাইম সব দশার জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে ফেললেও, *Anopheles* মশকীর পৌষ্টিকতন্ত্রে গ্যামিটোসাইটগুলো ধ্বংস করার এনজাইম না থাকায় এগুলো বেঁচে থাকে। বরং *Anopheles* এর ক্রপে উপস্থিত এনজাইমের উদ্দীপনায় গ্যামিটোসাইটগুলো পরবর্তী ধাপ শুরু করতে উদ্দীপ্ত হয়। মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি পর্যায় সম্পন্ন হয়। মশকীর দেহে সংঘটিত ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা– (ক) গ্যামিটোগনি ও (খ) স্পোরোগনি। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

MENINGES
Academic And Admission Care

(ক) গ্যামিটোগনি (Gametogony)

মশকীর ক্রপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন জননকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে ঘটে। যথা :

১। জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis): গ্যামিটোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা–

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস এবং (খ) উওজেনেসিস।

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis–sperm=শুক্রাণু, gen=গঠন, sis= পদ্ধতি) : মাইক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণু তথা পুংজনন কোষ গঠন প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা :

(i) প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে ৪ – ৮টি ক্ষুদ্রাকার হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণা (৪ – ৮টা) বিশিষ্ট হয়।

(ii) প্রতিটি কোণার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এদেরকে সাইটোপ্লাজমীয় অভিক্ষেপ বলে।

(iii) এর পরপরই জীবাণুর দেহটি কতগুলো ফ্ল্যাজেলা আকৃতির সরু মাকুর মতো মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণুতে পরিণত হয়। [ক্রপের গহ্বরে তাপের তারতম্যের দরুন এ প্রক্রিয়া ঘটে]। ক্রপের গহ্বরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পার্মাটোজেনেসিসের বিশেষ প্রক্রিয়াকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন (Exflagellation) বলে।

(iv) মাইক্রোগ্যামিটগুলো প্রথমে একসাথে থাকে, পরে এরা মাতৃকোষ থেকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সাঁতার কাটতে থাকে।

(খ) উওজেনেসিস (Oogenesis -Oo = ডিম্বাণু, gen = গঠন, sis = পদ্ধতি) : ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে ম্যাক্রোগ্যামিট বা ডিম্বাণু তথা স্ত্রীজননকোষ গঠন প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা—

(i) প্রথমে প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট-এর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় ও একটি করে সক্রিয় গোলাকার ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। এ ছাড়া পোলার বডি নামক আর একটি কোষের আবির্ভাব ঘটলেও শীঘ্রই তা নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) এর পরপরই ম্যাক্রোগ্যামিটের একপ্রান্ত কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলকে নিষেক শঙ্কু/কোণ (Fertilization cone) বা অভ্যর্থনা শঙ্কু (Reception cone) বলে। ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস এ শঙ্কুর কাছে অবস্থান করে।

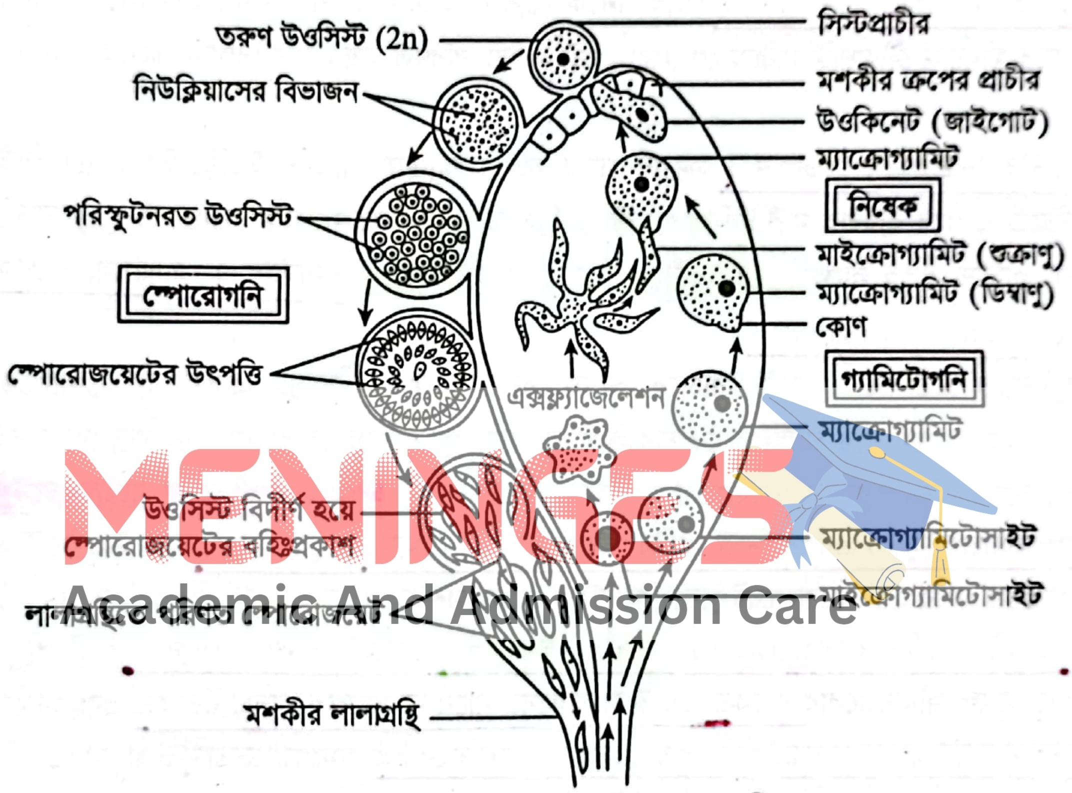

MENINGES
Academic And Admission Care

চিত্র ৪.১৯ : মশকীর দেহে *Plasmodium*-এর জীবনচক্র।

২। নিষেক ও জাইগোট গঠন (Fertilization and the formation of zygote) : মুক্ত মাইক্রোগ্যামিটগুলো এরপর পৃথক পৃথকভাবে ম্যাক্রোগ্যামিটের বা ডিম্বাণুর নিষেক শঙ্কুর দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটা ডিম্বাণুতে একটি করে শুক্রাণু প্রবেশ করে এবং নিষেক সম্পন্ন করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু হতে পরে গোলাকার জাইগোট (ডিপ্লয়েড) গঠিত হয়।

৩। উওকিনেট গঠন : মশকী রক্ত শোষণের ১২–১৪ ঘণ্টা পর গোল ও নিশ্চল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা কীটের মতো লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেট (Ookinete)-এ পরিণত হয়। এগুলো লম্বায় ১৮–২৪ μ এবং প্রস্থে ৩–৫ μ।

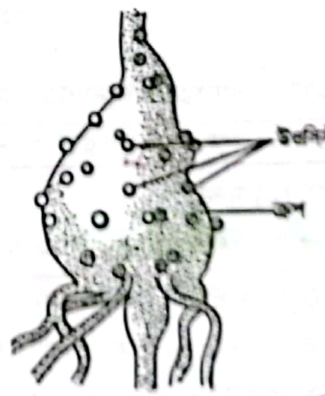

চিত্র ৪.২০ : মশকীর ক্রপের প্রাচীরে উওসিস্ট।

৪। উওসিস্ট : উওকিনেট 24 ঘণ্টার ভেতরেই মশকীর ক্রপের অন্তঃপ্রাচীর ভেদ করে বহিঃপ্রাচীরের ঠিক নিচে এসে পৌছায় এবং 40 ঘণ্টার মধ্যে সিস্ট (cyst) আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে

গোলাকার উওসিস্টে (Oocyst) পরিণত হয়। এর গায়ে সোনালি-বাদামি বর্ণের দানা ছড়িয়ে থাকে। উওসিস্টের ভেতরে একটি বড়ো গহ্বরের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত একটি মশকীর ক্রপের প্রাচীরে ৫০–৫০০টি পর্যন্ত উওসিস্ট দেখা যায়। ক্রপকে তখন ছোটো ছোটো গুটিময় দেখায়। উওসিস্ট পরিণত হতে ১০–২০ দিন সময় লাগে। উওসিস্ট পরিণত হলে তা স্পঞ্জের মতো দেখায় এবং ক্রপের প্রাচীর থেকে মশকীর দেহগহ্বরে উদগত থাকে। পরিণত উওসিস্টের আকার প্রথম অবস্থা থেকে ৪–৫ গুণ বড়ো হয় (৫০–৬০ μ)।

(খ) স্পোরোগনি (Sporogony) : স্পোরোজয়েটের উৎপত্তি

মশকীর ক্রপের প্রাচীরে দু' স্তরের মাঝে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় উওসিস্ট দশার জীবাণু যে জননের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট দশার জীবাণু সৃষ্টি করে তাকে **স্পোরোগনি** বলে। স্পোরোগনিকে অনেকে অযৌন জনন বলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি যৌন জননেরই পরবর্তী অবস্থা যার মাধ্যমে জীবাণুটি সক্রিয় স্পোরোজয়েট দশায় পরিণত হয়। স্পোরোগনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে ঘটে। যথা–

১। **উওসিস্টের নিউক্লিয়াস বিভাজন :** ক্রপের গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় প্রতিটি উওসিস্টের (2n) নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস পদ্ধতিতে ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। [ক্রপের প্রাচীরে একই সাথে ৫০–৫০০টি উওসিস্ট থাকতে পারে। উওসিস্টের এ মায়োসিসকে পোস্ট জাইগোটিক মায়োসিস (Post zygotic meiosis) বলে।]

২। **পরিস্ফুটনরত উওসিস্ট :** সিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম জমা হয় ও পরে তার চারদিকে কোষঝিল্লি গঠিত হয়ে বহু সংখ্যক গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়।

৩। **স্পোরোজয়েট গঠন :** এরপর কোষগুলো আকৃতি পরিবর্তন করে মাকু আকৃতির স্পোরোজয়েটে (Sporozoite) পরিণত হয়। স্পোরোজয়েটগুলো এরপর সিস্ট প্রাচীর ভেঙে মশকীর হিমোসিলে মুক্ত হয়। একটি উওসিস্টে প্রায় দশ হাজার স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। স্পোরোজয়েটগুলো হিমোসিল থেকে মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকে। একটি মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রায় ৩,২৬,০০০ স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। রক্তপিপাসু মশকী কোনো মানুষের রক্ত পান করলে জীবাণুগুলোর শতকরা ১০% লালারসের সাথে মানবদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। মশকীর লালাগ্রন্থিতে স্পোরোজয়েটগুলো প্রায় ২ মাস অবস্থান করে। এ সময়ের ভেতরে এরা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

MENINGES
Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়ার পরজীবীর জীবনচক্রে জনুঃক্রম

কোনো জীবের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুঃক্রম (alternation of generation) **বলে।** ম্যালেরিয়া জীবাণু একটি অন্তঃপরজীবী প্রোটোজোয়া প্রাণী। এদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম ঘটে।

হ্যাপ্লয়েড (n) দশা :

স্পোরোজয়েট দশা (n) : মশকীর দেহে স্পোরোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্পোরোজয়েট দশা (n)। এ স্পোরোজয়েটবাহী মশকী মানুষকে দংশন করার সময় লালা নিঃসরণ করে। এ লালা এন্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করে, জায়গাটিকে অবশ ও পিচ্ছিল করে। আর এ লালার সাথে জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n) : স্পোরোজয়েট (n) মানুষের যকৃতকে আক্রমণ করে সেখানে হেপাটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। হেপাটিক সাইজোগনির ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n)। মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট মানুষের লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রোগ্যামিটোসাইট (n) ও ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট (n)।

CamScanner

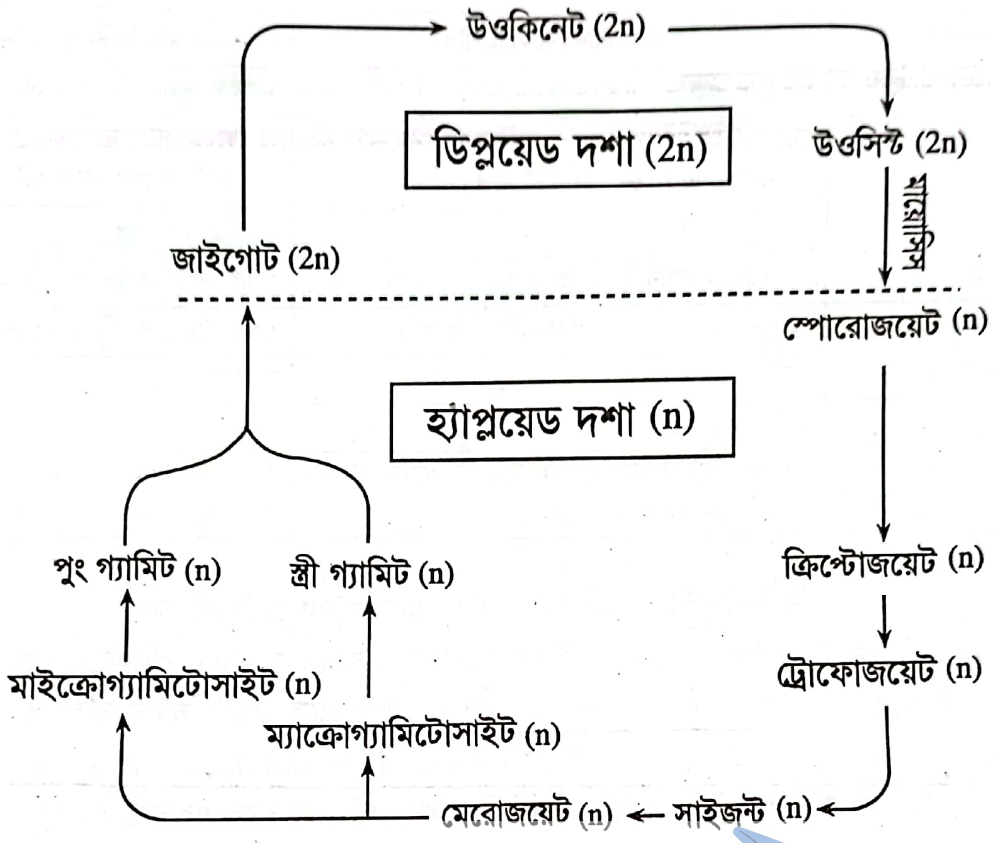

চিত্র ৪.২১ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে জনুঃক্রমের রেখাচিত্র।

MENINGES
Academic And Admission Care

ডিপ্লয়েড (2n) দশা :

জাইগোট দশা (2n) : মশকীর দেহে গ্যামিটোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্ত্রী গ্যামিট ও পুং গ্যামিট। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট (2n) সৃষ্টি হয়।

উওকিনেট (2n) : জাইগোট রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে উওকিনেট (2n)। পরে উওকিনেট উওসিস্ট (2n)-এ পরিণত হয়। ডিপ্লয়েড (2n) উওসিস্ট মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোরোজয়েট সৃষ্টি করে। এ হ্যাপ্লয়েড স্পোরোজয়েট দশা মশকীর লালার মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুঃক্রম বিদ্যমান।

জনুঃক্রমের তাৎপর্য (Significance of Alternation of Generation)

১। জনুঃক্রম জীবাণুর প্রজাতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

২। জনুঃক্রম জীবাণুর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

৩। জনুঃক্রম জীবাণুর বিস্তৃতিতে সহায়তা করে।

৪। জনুঃক্রম জীবাণুর জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে।

৫। জনুঃক্রম প্রজাতিতে বৈচিত্র্য আনে ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

CamScanner

ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন ও যৌন চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন চক্র (সাইজোগনি)	যৌন চক্র (স্পোরোগনি)
১. পোষকের যে স্থানে ঘটে	মানুষের যকৃত ও লোহিত কণিকায়।	মশকীর ক্রপের মধ্যে এবং হিমোসিলে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	মেরোজয়েট, ট্রফোজয়েট, সাইজন্ট, সিগনেট রিং ও রোজেট এ চক্রের মধ্যবর্তী ধাপ।	এ চক্রে গ্যামিট, জাইগোট, উওকিনেট, উওসিস্ট ও স্পোরোজয়েট দেখা যায়।
৩. সর্বশেষ ধাপ	গ্যামিটোসাইট।	স্পোরোজয়েট।
৪. হিমোজয়েন	এ চক্রের শেষের দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।	কখনোই হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় না।
৫. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	কাঁপুনিসহ জ্বর, সে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ।	তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।
৬. চক্রের পুনরাবৃত্তি	ঘটে।	ঘটে না।
৭. গ্যামিট	সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্টি হয়।
৮. জাইগোট	যেহেতু গ্যামিট সৃষ্টি হয় না তাই জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।	পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ঘটিয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে।

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ (Transmission of Malaria)

স্ত্রী *Anopheles* মশকীই ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটানোর একমাত্র মাধ্যম। পৃথিবীতে প্রায় দু'শত প্রজাতির *Anopheles* মশকী থাকলেও মূলত ৬টি প্রজাতিই এ রোগের ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটায় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। প্রজাতিগুলো হলো- *Anopheles culicifacies, A. stephensi, A. fluviatilis, A. dirus, A. sundaicus, A. minimus*। মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশের পর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে একসময় গ্যামিটোসাইট গঠন করে। *Plasmodium vivax* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো মানুষের রক্তে ৭ দিন, কিন্তু *Plasmodium falciparum* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো ৩০–৬০ দিন, এমনকি ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ হতে এরা মশকীর দেহে প্রবেশের সুযোগ পেলে পরবর্তী চক্র সম্পন্ন করতে শুরু করে। মশকীর প্রতিবার দংশনে *Plasmodium vivax* এর অন্তত: ৬টি এবং *Plasmodium. falciparum* এর অন্তত: ১২টি গ্যামিটোসাইট মশকীর দেহে প্রবেশ করে। যাদের রক্তে পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্যামিটোসাইট থাকে তাদের সক্রিয় (active) এবং যাদের রক্তে গ্যামিটোসাইটগুলো কোনো এক সময় কার্যকর হচ্ছে এমন অবস্থায় থাকে তাদের **বাহক** বলে। রক্তপান করার সময় মশকীর দেহে বিভিন্ন দশার জীবাণু প্রবেশ করলেও একমাত্র গ্যামিটোসাইটগুলো বেঁচে থাকে, অন্যান্য দশায় জীবাণুগুলো মশকীর এনজাইমের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। গ্যামিটোসাইটগুলো গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি ধাপের মাধ্যমে অবশেষে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এ মশকী কোনো মানুষকে দংশন করলে মানুষ এ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। এভাবে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে এবং ম্যালেরিয়া জন-জনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

MENINGES Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর রক্তশূন্যতার কারণ কী?

১। সাইজোগনি শেষে লোহিত রক্তকণিকার প্রাচীর ভেঙ্গে মেরোজয়েট রক্তরসে মুক্ত হয়। এতে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। আক্রান্ত রোগীর যকৃত ও প্লীহা স্ফীত হয়ে যায়, যার ফলে এগুলো থেকে রক্তকণিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়।

৩। আক্রান্ত রোগীর প্লীহা থেকে lysolecithin নামক এক ধরনের বিশ্লেষী পদার্থ নিঃসৃত হয় যা লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে।

৪। পরজীবী haemolysin নামক এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা স্বাভাবিক অনাক্রান্ত লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে।

CamScanner

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার (প্রতিরোধ) ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention & Control of Malaria)

ম্যালেরিয়া যেহেতু মশকী বাহিত একটি রোগ তাই মশকী প্রতিরোধের মাধ্যমে এ রোগ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব। ম্যালেরিয়া প্রতিকার তিনভাবে হতে পারে; যথা– (ক) মশকী নিধন, (খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা এবং (গ) চিকিৎসা।

(ক) মশকী নিধন : মশককুলের বংশ পরিবেশ হতে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়–

(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস : মশকীরা বদ্ধ পচা পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশের পরিত্যক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা : পচা পানিতে ডিম ফুটে মশকীর লার্ভা ও পিউপা দশা সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোলজাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে এরা অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এছাড়া বিএইচসি (BHC), ডায়েলড্রিন (dieldrin) ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। পানিতে জুভেনাইল হরমোন ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর রূপান্তর ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

উপরোক্ত সবগুলো পদ্ধতিই কমবেশি পানি তথা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। তাই যে সকল জলাশয়ে লার্ভা বা পিউপা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঐ সকল জলাশয়ে গাপ্পি, কই, শিং, খলসে, তেলাপিয়া, পুঁটি, টাকি ইত্যাদি জাতীয় লার্ভিভোরাস মাছ চাষ করলে এরা মশকীর লার্ভা ও পিউপাগুলোকে ভক্ষণ করে। এতে মশকী নিধনের পাশাপাশি পরিবেশও থাকে দূষণমুক্ত।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন : ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে মশকীকুলকে ধ্বংস করা যায়।

MENINGES
Academic And Admission Care

(iv) কীটনাশক ব্যবহার : অধিকাংশ শহর এলাকাতে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

(খ) মশকীর দংশনের হাত থেকে আত্মরক্ষা : ঘরের দরজা-জানালায় মাশকীরোধী ঘন তারের নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আত্মরক্ষা করা যায়। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা যায়। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার এবং সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়া প্রয়োগ করা।

(গ) ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা (Treatment) : ম্যালেরিয়া রোগীকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা আবশ্যক। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ওষুধ। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি হয়েছে। যেমন-ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্লোর, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

আশঙ্কার কথা : ম্যালেরিয়া জীবাণু হয়ে ওঠেছে ঔষধ প্রতিরোধী। ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে ওঠেছে বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া জীবাণু। আরটিমিসিনিন প্রতিরোধী হয়ে ওঠেছে *P. falciparum* জীবাণু।

> বি. দ্র. সুস্থদেহে সিনকোনা রস কম্প জ্বর সৃষ্টি করে। কম্প জ্বরে (ম্যালেরিয়া) সিনকোনা রস সেবনে রোগ আরোগ্য হয়। এ থেকে হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে।

ম্যালেরিয়ার টিকা (Malarial Vaccine) : দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTSS নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA) ইতোমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন ও PATH Malaria নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় এ যুগান্তকারী আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছে। চার ডোজের এ টিকা *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের শিশুরা এ পরজীবী কর্তৃক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং এতে এদের মৃত্যুর হারও বেশি। তবে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার প্রভৃতি সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের দেশগুলো এ রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে পরিগণিত।

দলগত কাজ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রটি অঙ্কন করে ক্লাসে উপস্থাপন করো।

সার-সংক্ষেপ

ভাইরাস : ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু। এরা জীবকোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে, আবার জীবকোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় জড় বস্তুর অবস্থায় বিরাজ করে। ভাইরাস দণ্ডাকার, গোলাকার, ঘনক্ষেত্রাকার, ব্যাঙাচি আকার বা ডিম্বাকার হতে পারে। TMV ভাইরাস দণ্ডাকার, HIV ভাইরাস গোলাকার, T_2 ভাইরাস ব্যাঙাচি আকার। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড RNA যেমন- TMV, মানুষের পোলিও ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA যেমন– T_2 ভাইরাস, TIV, এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি। উদ্ভিদ, প্রাণী (মানুষসহ), পশুপাখির বহু রোগের কারণ ভাইরাস। HIV দিয়ে মানুষে AIDS রোগ, ফ্ল্যাভি-ভাইরাস দিয়ে ডেঙ্গুজ্বর, র‍্যাবিস ভাইরাস দিয়ে জলাতঙ্ক, ভেরিওলা ভাইরাস দিয়ে গুটিবসন্ত রোগ হয়।

T_2-ফায : T_2 ব্যাকটেরিওফায সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। মাথা ও লেজ নামক দুটি অংশ নিয়ে T_2-ফায-এর দেহ গঠিত। এর নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বিসূত্রক DNA যা ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে বলে এদের নাম হয়েছে ব্যাকটেরিওফায।

MENINGES Academic And Admission Care

ব্যাকটেরিয়া : একবচনে ব্যাকটেরিয়াম। এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক এবং আদিকোষী। এরা দলবেঁধে থাকতে পারে, তবে এককোষী। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া। মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে এদের আবাসস্থল। এদের দেহে ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, তবে জড় কোষ প্রাচীর আছে। ব্যাকটেরিয়া বহু রোগের কারণ, যেমন– কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, প্রতিষেধক টিকা। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে, দুধ থেকে দই তৈরি, পনির তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

কক্কাস : গোলাকার ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় কক্কাস। একা একা থাকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস, জোড়ায় জোড়ায় থাকে ডিপ্লোকক্কাস, চেইনের মতো থাকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস।

দ্বি-ভাজন : দ্বি-ভাজন কোষ বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় একটি কোষের নিউক্লিয়ার বস্তু এবং সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন। এটি একটি অযৌন জনন প্রক্রিয়া।

মেরোজাইগোট : স্ত্রী এবং পুং জনন কোষের যৌন মিলনের ফলে যে কোষের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় জাইগোট। জাইগোটে স্ত্রী ও পুং জনন কোষের পূর্ণাঙ্গ অংশ মিলিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দাতা কোষের (পুং জনন কোষ) আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে (স্ত্রী জনন কোষ) প্রবেশ করে, তাই গ্রহীতা কোষ দাতা কোষের পূর্ণ বংশগতীয় বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহণের মাধ্যমে যে জাইগোট তৈরি হয় তাকে বলা হয় মেরোজাইগোট। এটি যৌন জনন প্রক্রিয়া, তবে এতে কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

CamScanner

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। যেসব জীব অতি ক্ষুদ্রাকার তাই অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ভালো দেখা যায় না সেসব জীবই **অণুজীব**।

২। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় সে শাখাকে বলা হয় **অণুজীববিজ্ঞান/অণুজীবতত্ত্ব/মাইক্রোবায়োলজি**।

৩। **ভাইরাস** হলো প্রোটিন-আবরণবেষ্টিত নিউক্লিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ অতি আণুবীক্ষণিক (ultra microscopic) বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

৪। সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস হলো TMV (টোবাকো মোজাইক ভাইরাস)।

৫। ভাইরাস নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হলো **ভাইরোলজি**।

৬। বিজ্ঞানী Stanley কে ভইরোলজির জনক বলা হয়ে থাকে।

৭। ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

৮। ভাইরাসে একই সাথে DNA এবং RNA থাকে না, এর যেকোনো একটি থাকে।

৯। যেসব ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড RNA, সেসব ভাইরাসকে বলা হয় RNA ভাইরাস; আবার যেসব ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA তাদেরকে বলা হয় DNA ভাইরাস।

১০। T_2 ভাইরাস হলো DNA ভাইরাস, আর TMV হলো RNA ভাইরাস।

১১। ভাইরাস **বাধ্যতামূলক পরজীবী**।

১২। পোষক কোষে কোনো ভাইরাস-প্রোটিনের জন্য রিসেপ্টর সাইট থাকলে কেবল তখনই ঐ ভাইরাস সেই পোষক জীবকে আক্রমণ করতে পারে।

১৩। ভাইরাস ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো **বিষ**।

১৪। যেকোনো ভাইরাসের কেন্দ্রে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে (RNA অথবা DNA) এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে ঘিরে প্রোটিনের একটি আবরণ থাকে যাকে **ক্যাপসিড** বলে।

১৫। ক্যাপসিড-এর ইউনিটকে ক্যাপসোমিয়ার বলে।

১৬। লিপোপ্রোটিন আবরণবিশিষ্ট ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলে।

১৭। কোনো ভাইরাস তার নির্দিষ্ট পোষক জীব (যেমন-পাখি) থেকে পরে সম্পর্কহীন অন্যজীবে (যেমন-মানুষ) ছড়িয়ে পড়লে তাকে **ইমার্জিং ভাইরাস** বলে।

১৮। সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসকে **ভিরিয়ন** বলে।

১৯। এক সূত্রক বৃত্তাকার সংক্রামক RNA হলো **ভিরয়েডস**।

২০। সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হলো **প্রিয়নস**।

২১। যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয় তাদেরকে **ফায** বা **ব্যাকটেরিওফায** বলে।

২২। T_2 ব্যাকটেরিওফায-এর DNA দ্বিসূত্রক।

২৩। হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস দ্বারা **ক্যাপোসিস সারকোমা** রোগ হয়।

২৪। লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেপাটাইটিস-B ভাইরাস দিয়ে হেপাটাইটিস হয়ে থাকে।

২৫। হেপাটাইটিস-B নির্ণয়ের জন্য রক্তের এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পরীক্ষা করতে হয়।

২৬। ডেঙ্গুজ্বর হয়ে থাকে ডেঙ্গু ভাইরাস দিয়ে। এর বাহক হলো *Aedes aegypti* ও *A.albopictus* স্ত্রী মশা।

২৭। রক্তে NSI অ্যান্টিজেন এবং IgG ও IgM অ্যান্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু শনাক্ত করা হয়।

২৮। ডেঙ্গু জ্বরে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২৯। পেঁপের রিংস্পট রোগ হয় Papaya Ringspot Virus (PRSV) ভাইরাস দ্বারা।

MENINGES Academic And Admission Care

CamScanner

৩০। গ্রিক Bakterion (অর্থ ছোটো রড/দণ্ড) হতে ব্যাকটেরিয়া শব্দের উৎপত্তি।
৩১। **অ্যান্ট ভ্যান লীউয়েন হুক-কে ব্যাকটেরিওলজি ও প্রোটোজওলজির জনক বলা হয়।**
৩২। অনেকেই লুই পাস্তুরকে আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলে থাকেন।
৩৩। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় সেই শাখাকে **ব্যাকটেরিওলজি** বলা হয়।
৩৪। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম **আর্কিব্যাকটেরিয়া**।
৩৫। Methanogens জাতীয় আর্কিব্যাকটেরিয়া প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে দু' বিলিয়ন টন মিথেন গ্যাস মুক্ত করে।
৩৬। যেসব ব্যাকটেরিয়া মিথেন সৃষ্টি করে তাদেরকে methanogens বলা হয়।
৩৭। ব্যাকটেরিয়া হলো জড় কোষ প্রাচীরবিশিষ্ট এককোষী আদিকেন্দ্রিক অণুজীব যা সাধারণত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি করে।
৩৮। গোলাকার ব্যাকটেরিয়াকে **কক্কাস** বলে।
৩৯। দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে **ব্যাসিলাস** বলে।
৪০। অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেট (NO_3^-) এ পরিণত করা হলো **নাইট্রিফিকেশন। যেসব ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিফিকেশন** করে তদেরকে বলা **হয়** নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া। যেমন- *Nitrosomonus, Nitrobacter*।
৪১। মানুষের অন্ত্রে *E.coli* বিভিন্ন ভিটামিন (K, B_2 বায়োটিন ইত্যাদি) উৎপন্ন করে দেহকে সরবরাহ করে।
৪২। *Clostridium botulinum* নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে *botulin* নামক বিষ সৃষ্টি করে যা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে।
৪৩। *Xanthomonas oryzae pv oryzae* দ্বারা ধানের ব্লাইট রোগ হয়।
৪৪। *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মানুষের কলেরা রোগ হয়।
৪৫। টক দই-এ গোলাকার ও দণ্ডাকার (কক্কাস ও ব্যাসিলাস) ব্যাকটেরিয়া থাকে। *Streptococcus* হলো গোলাকার এবং *Lactobacillus* হলো দণ্ডাকার।
৪৬। ফরাসি ডাক্তার Charles Laveron (১৮৮০) ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত রক্তকণিকা থেকে ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন।
৪৭। স্যার রোনাল্ড রস আবিষ্কার করেন যে, Anopheles মশা এ রোগের জীবাণু এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়ায়।
৪৮। ম্যালেরিয়া জীবাণু *Plasmodinm* গণভুক্ত, আমাদের দেশে সাধারণত *P. vivax* নামক প্রজাতি দিয়ে ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে এবং জ্বর আসে ৪৮ ঘণ্টা পর পর।
৪৯। *P. vivax* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে মানুষ ও মশকীর এ পোষক দেহের প্রয়োজন হয়।
৫০। মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়া জীবাণু অযৌন পদ্ধতিতে জীবনচক্র সম্পন্ন করে।
৫১। যে জীবনচক্রে সাইজন্ট বিদ্যমান থাকে তাকে **সাইজোগনি** বলে।
৫২। *Anophelis* মশকীর লালাগ্রন্থিতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজয়েট থাকে যা মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানুষের রক্ত স্রোতে প্রবেশ করে।
৫৩। ৪৮ ঘণ্টা পরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসাই *P. vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার লক্ষণ।

MENINGES
Academic And Admission Care

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিচের কোন রোগটি ভাইরাস দ্বারা হয়?
(ক) টাইফয়েড (খ) নিউমোনিয়া (গ) ইনফ্লুয়েঞ্জা (ঘ) হুপিংকাশি

২। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হলো—
(i) উচ্চজ্বর, র‍্যাশ, পেশি ও হাড় ব্যথা এবং চোখে রক্ত জমাট বাঁধা (ii) কাঁপুনিসহ জ্বর আসা
(iii) কখনো রক্তক্ষরণসহ জ্বর হওয়া।

CamScanner

ক. আকার অনুযায়ী ভাইরাসকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়।

i. **দন্ডাকার (Rod-shaped) :** এগুলোর আকার অনেকটা দন্ডের মতো। যেমন- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস ইত্যাদি।

ii. **গোলাকার (Spherical) :** এগুলো অনেকটা গোলাকার, বর্তুলাকার বা বহুভূজাকার। যেমন- পোলিও ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস, **Human Immunodeficiency Virus (HIV)** ইত্যাদি।

iii. **ঘনক্ষেত্রাকার (Cubical) :** এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন- ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস।

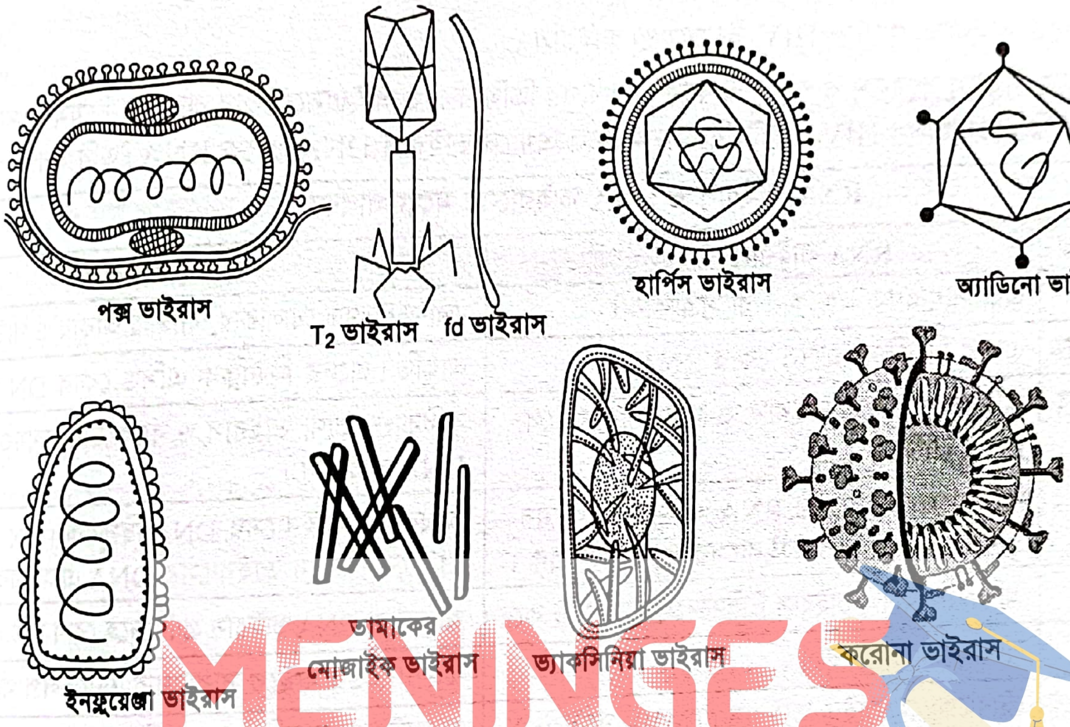

MENINGES
Academic And Admission Care

চিত্র ৪.১.১ : বিভিন্ন আকারের ভাইরাস

iv. **ব্যাঙাচি আকার (Tadpole shaped) :** এরা ব্যাঙাচির মতো মাথা ও লেজবিশিষ্ট। যেমন- T_2, T_4, T_6।

v. **ডিম্বাকার (Oval) :** এগুলো দেখতে ডিমের মতো। যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

vi. **সিলিন্ড্রিকাল (Cylindrical) :** এদের আকার লম্বা সিলিন্ডারের মতো, যেমন- Ebola virus.

খ. ভাইরাস-দেহের নিউক্লিক এসিডের ধরন অনুযায়ী ভাইরাস দুধরনের।

i. **DNA ভাইরাস :** এদের দেহে নিউক্লিক এসিড হিসেবে শুধু DNA থাকে।
   i. **একক সূত্রক DNA** (যেমন- কোলিফায ভাইরাস)।
   ii. **দ্বিসূত্রক DNA** (যেমন- ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস)।

ii. **RNA ভাইরাস :** এদের দেহে নিউক্লিক এসিড হিসেবে শুধু RNA থাকে।
   i. **একক সূত্রক RNA** (যেমন- TMV)।
   ii. **দ্বিসূত্রক RNA** (যেমন- রিওভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস)।

গ. পোষকদেহ অনুযায়ী ভাইরাস নিম্নলিখিত ধরনের হয়ে থাকে।

i. **উদ্ভিদ ভাইরাস :** উদ্ভিদদেহে বসবাসকারী এবং রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস; যেমন- TMV।

ii. **প্রাণী ভাইরাস :** প্রাণিদেহে বসবাসকারী এবং রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, যেমন- HIV।

iii. **ব্যাকটেরিওফায :** ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস, যেমন- T_2 ভাইরাস।

নিজের জেনেটিক পদার্থের দ্বৈতকরণ (duplication) ঘটিয়ে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করাতে পারে, ভাইরাস তা পারে না। বরং একবার কোনো জীবন্ত কোষে প্রবেশের সুযোগ পেলে ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড থেকে শুরু করে ক্যাপসিড, ভাইরাল এনজাইম ও কিছু ক্ষেত্রে এনভেলপ পর্যন্ত নির্মাণে জীবন্ত কোষই সক্রিয় হয়ে সব তৈরি করে দেয় শেষে নিজেও বিলীন হয়ে যায়।

৪. **পোষক নির্দিষ্টতা** : ভাইরাস সাধারণত পোষক নির্দিষ্ট। যেমন ফায ভাইরাস শুধু ব্যাকটেরিয়াকে, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস শুধু কয়েক প্রজাতির উদ্ভিদকে, র‍্যাবিস ভাইরাস শুধু স্তন্যপায়ীদের আক্রমণ করে। পোষক নির্দিষ্টতার ফলে ভাইরাসের নিরাপদ বংশবৃদ্ধি, বিস্তার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

৫. **আক্রমণস্থল নির্দিষ্টতা** : শুধু পোষক নির্দিষ্টতার মধ্যে ভাইরাসের আক্রমণ সীমিত থাকে না, এগুলো পোষক দেহের যেখানে সেখানে আক্রমণও করে না। মানবদেহ আক্রমণকারী কিছু ভাইরাসের আক্রমণস্থলও স্বনির্দিষ্ট থাকে, যেমন–HIV নির্দিষ্ট ধরনের শ্বেত রক্তকণিকাকে আক্রান্ত করে, পোলিও ভাইরাস সুষুম্না স্নায়ুর কোষকে, হেপাটাইটিস ভাইরাস কেবল যকৃত কোষকে আক্রান্ত করে। এর ফলে ভাইরাসের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না।

৬. **জিনগত পরিবর্তন** : ভাইরাসে জিনগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। জিনগত পরিবর্তিত প্রজন্মগুলো মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেয়। আজ যে ভ্যাকসিন একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর, আগামীকাল সে কার্যকারিতা আর থাকে না। এভাবে বিবর্তিত হচ্ছে ভাইরাস। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাইরাসের মধ্যে **ফ্লু ভাইরাস** অন্যতম। এ কারণে প্রতিবছর নতুন করে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয়।

ইমার্জিং ভাইরাস (Emerging virus) : ভাইরাসের পরজীবীতা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাস কখনো কখনো স্বাভাবিক পোষক প্রজাতি থেকে সম্পর্কহীন অন্যতম পোষক প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফ্লু (Flu) বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকৃত পোষক ছিল পাখি যা পরবর্তীতে সরাসরি মানুষে রোগ বিস্তার করে। ১৯১৮-১৯১৯ সালে পৃথিবীতে ২১ মিলিয়নের বেশি মানুষ এই ফ্লুতে মারা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা HIV-র প্রকৃত পোষক বানর, যা পরে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। আদি পোষক থেকে পরে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টিকারী এ ভাইরাসকে বলা হয় **ইমার্জিং ভাইরাস** (emerging virus)। উদাহরণ HIV, SARS, Nile virus, Ebola.

MENINGES
Academic And Admission Care

ভাইরাসের সাধারণ গঠন (General Structure of Virus)

একটি সংক্রমণযোগ্য ভাইরাস কণাকে **ভিরিয়ন** (virion) বলে। ভাইরাসের গঠনগত প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে **ক্যাপসিড** (প্রোটিন) ও **নিউক্লিক এসিড**। এগুলোকে **নিউক্লিওক্যাপসিড** বা **নিউক্লিওপ্রোটিন** কণাও বলা হয়। প্রাণী ভাইরাসের ক্ষেত্রে সাধারণত নিউক্লিওক্যাপসিড কণার বাইরে যে বহিরাবরণ থাকে তার নাম **এনভেলপ** (envelope)। খুব কম ক্ষেত্রে ভাইরাসের দেহে কয়েকটি এনজাইম-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। নিচে একটি সাধারণ ভাইরাসের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো।

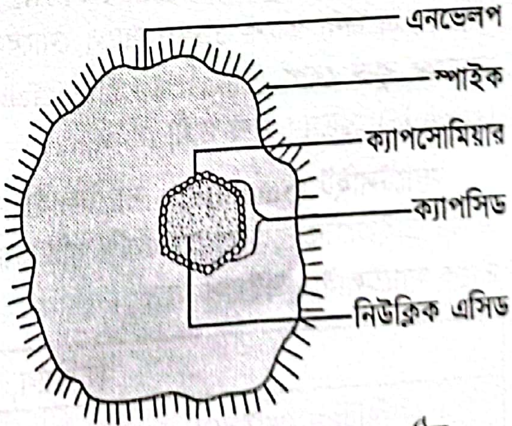

চিত্র ৪.১.২ : ভাইরাসের অন্তর্গঠন

ক্যাপসিড (Capsid) : ভাইরাস-দেহের মধ্যভাগে নিউক্লিক এসিডকে ঘিরে থাকা প্রোটিন আবরণকে **ক্যাপসিড** বলে। ক্যাপসিড প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য প্রোটিন সাব-ইউনিট বা উপ-একক নিয়ে গঠিত, এগুলোকে **ক্যাপসোমিয়ার** (capsomere) বলে। ক্যাপসিড গঠনে ক্যাপসোমিয়ারের সজ্জাক্রমে প্রতিসাম্য (symmetry) থাকে। ক্যাপসিড সাধারণত প্রোটিন নির্মিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এতে স্নেহ পদার্থ ও শ্বেতসারও পাওয়া যায়। অন্তঃস্থ নিউক্লিক এসিডকে রক্ষা করা ক্যাপসিডের প্রধান কাজ। এ ছাড়া ক্যাপসিড অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে।

নিউক্লিওয়েড (Nucleoid) : ক্যাপসিড মধ্যস্থ নিউক্লিক এসিডকে **নিউক্লিওয়েড** বলে। নিউক্লিওয়েড সবসময় যে কোনো একধরনের নিউক্লিক এসিড অর্থাৎ DNA বা RNA নিয়ে গঠিত। DNA দ্বিসূত্রক বা একসূত্রক হয়। আবার RNA-ও একসূত্রক বা দ্বিসূত্রক হতে পারে। দ্বিসূত্রক DNA যুক্ত ভাইরাস হচ্ছে T_2, T_4 ফায ভাইরাস। একসূত্রক DNA

CS CamScanner

ভাইরাস হচ্ছে কোলিফায ইত্যাদি। একসূত্রক RNA যুক্ত ভাইরাস হলো TMV। রিওভাইরাস দ্বিসূত্রক RNA যু ভাইরাস। সাধারণত একটি মাত্র নিউক্লিক এসিড অণু নিয়ে নিউক্লিওয়েড গঠিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একা অণু থাকতে পারে। যেমন–রিট্রো ভাইরাসে দুইঅণু একসূত্রক RNA থাকে। নিউক্লিওয়েড কুন্ডলিত অবস্থায় থাকে নিউক্লিওয়েড হচ্ছে ভাইরাসের **বংশগতি বস্তু**। পোষক দেহ সংক্রমণ ও প্রতিলিপি গঠনে নিউক্লিওয়েড প্রধান ভূমি পালন করে।

এনভেলপ (Envelope) : কিছু সংখ্যক প্রাণী ভাইরাস, খুব কম সংখ্যক উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়াল ভাইরা ক্যাপসিডের বাইরে একটি ১০-১৫ nm পুরু আবরণ থাকে, একে **এনভেলপ** বলে। এটি প্রোটিন, লিপিড ও শর্করা দি গঠিত। এনভেলপের গঠনগত একককে **পেলপোমিয়ার** (pelpomere) বলে। এনভেলপযুক্ত ভাইরাসকে **লিপোভাইরা** (Lipovirus) বলা হয়। এনভেলপের বহিঃতল মসৃণ বা কাঁটাযুক্ত হতে পারে, কাঁটাগুলোকে **স্পাইক** (spike) বলে এনভেলপবিহীন ভাইরাসকে **নগ্ন ভাইরাস** (naked virus) বলে।

এনজাইম (Enzymes) : ভাইরাসের দেহে সবসময় এনজাইম থাকে না। কিছু ক্ষেত্রে এনজাইমের উপস্থিতি দে যায়, যেমন-ব্যাকটেরিওফাযে **লাইসোজাইম**, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে **নিউরামিনিডেজ** এবং অন্যান্য এনজাইমের মধ্যে আ RNA **পলিমারেজ**, RNA **ট্রান্সক্রিপটেজ**, **রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ** ইত্যাদি।

সাবভাইরাল সত্ত্বা (Subviral agents)

ভিরিয়ন (Virion) : নিউক্লিক এসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে **ভিরিয়ন** বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় **নিউক্লিওক্যাপসি** প্রতিটি ভিরিয়নে সর্বোচ্চ ২০০০ – ২১৩০টি **ক্যাপসোমিয়ার** থাকে।

ভিরয়েডস (Viroids) : ভিরয়েডস হলো সংক্রামক RNA। Theodore Diener এবং W.S Rayner ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভিরয়েডস আবিষ্কার করেন। **ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA অণু যা কয়েক শত নিউক্লিওটা নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহুগুণে ক্ষুদ্র**। কেবলমাত্র উদ্ভিদেই ভিরয়েডস পাওয়া যায়। এরা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে এবং মাতৃউদ্ভিদ থেকে সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ পোষকের এনজাইম ব্যবহার করে এ সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানীগণ এখন ধারণা করছেন হেপাটাইটিস-ডি এর কারণ ভিরয়েডস। ভিরয়েড নারিকেল গা **ক্যাডাং রোগ** তৈরি করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

প্রিয়নস (Prions) : প্রিয়নস হলো একপ্রকার সংক্রামক সত্ত্বা, যা শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এরা পোষক কোষে জিনোমে প্রবেশ করে নতুন প্রিয়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এরা শুধু প্রাণীর রো সৃষ্টি করে। Stanley B. Prusiner (1982) প্রিয়নস আবিষ্কার করেন এবং ভেড়ার স্ক্যাপি রোগে এটি প্রথম পর্যবেক্ষ করেন। এ জন্য তাকে ১৯৯৭ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। প্রিয়নস দিয়ে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। এ মানুষের **কুরু রোগ** (kuru) ও Creutzfeldt-Jakob, গরুর **ম্যাড কাউ** (mad cow) এবং ভেড়া ও ছাগলের স্ক্র (scrapie) রোগের জন্য দায়ী।

স্যাটেলাইট (Satellite) : স্যাটেলাইট হলো কেবল নিউক্লিক এসিড গঠিত সত্ত্বা যা পোষক কোষের মধ্যে অ **একটি ভাইরাসের** সাহায্যে প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম। যখন কোনো প্রোটিন আবরণ দ্বারা স্যাটেলাইট আবদ্ধ হয় তখ তাকে **স্যাটেলাইট ভাইরাস** বলে।

ভিরিয়ন, ভিরয়েডস ও প্রিয়নস এর মধ্যে পার্থক্য

ভিরিয়ন (ভাইরাস)	ভিরয়েডস	প্রিয়নস
১. RNA অথবা DNA থাকে।	১. RNA থাকে, DNA থাকে না।	১. নিউক্লিক এসিড থাকে না।
২. এতে প্রোটিন থাকে।	২. এতে প্রোটিন থাকে না।	২. এতে শুধু প্রোটিন থাকে।
৩. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে।	৩. শুধু উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে।	৩. শুধু প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে।

CS CamScanner

দুটি ভাইরাসের গঠন —TMV ও T_2 ফায

১. টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus) বা TMV

দন্ডাকৃতির এই ভাইরাসটির দৈর্ঘ্য ২৮০ nm থেকে ৩০০ nm এবং প্রস্থ ১৫ nm থেকে ১৮ nm পর্যন্ত হয়ে থাকে। TMV ভাইরাস প্রোটিন ও RNA দিয়ে গঠিত। বাইরের পুরু প্রোটিন আবরণটিকে **ক্যাপসিড** বলে। ক্যাপসিড বহু উপএকক দিয়ে গঠিত। এদের নাম **ক্যাপসোমিয়ার**। TMV তে প্রায় ২২০০ ক্যাপসোমিয়ার পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮ অ্যামিনো এসিড থাকে। ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে একসূত্রক RNA **কোর** (core) থাকে। RNA সূত্রটি ৬৫০০ নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত। ওজন হিসেবে এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন। TMV-এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA-এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রতিটি প্রোটিন উপ-এককের আনবিক ওজন ১৭,০০০ ডাল্টন।

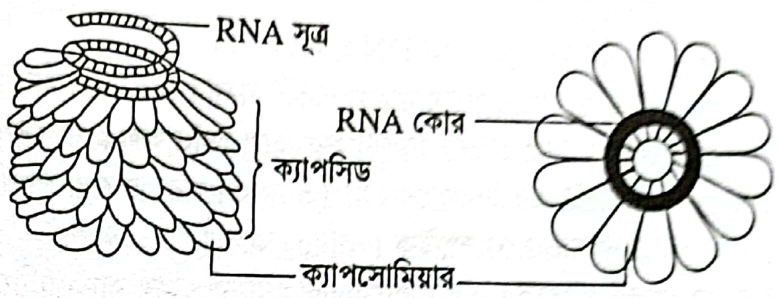

চিত্র ৪.১.৩ : TMV ভাইরাস; বামে-পূর্ণাঙ্গ গঠন; ডানে-প্রস্থচ্ছেদ

২. ব্যাকটেরিওফায বা T_2 ফায (Bacteriophage or T_2 Phage)

ফায (Phage) একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো 'to eat' বা **ভক্ষণ করা**। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐ সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। ফায-এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং একসময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। **যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলে।**

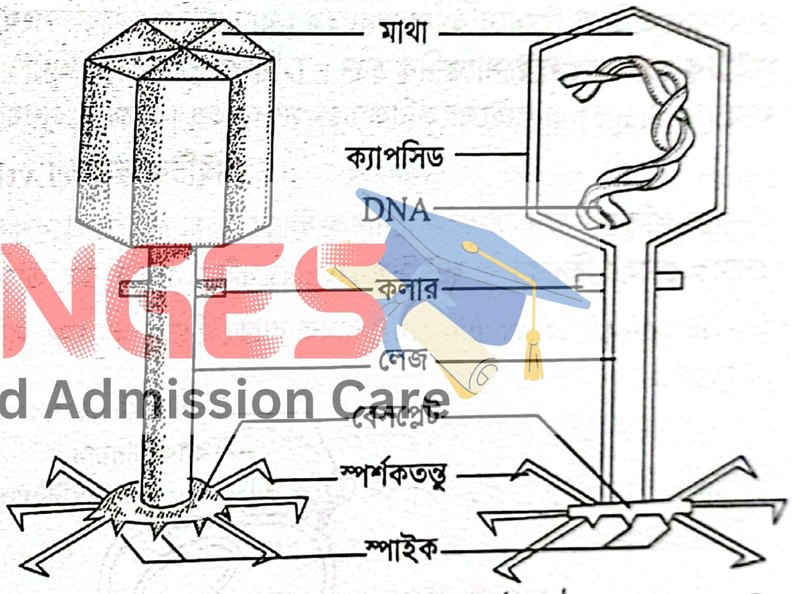

চিত্র ৪.১.৪ : T_2-ব্যাকটেরিওফায; বায়ে-পূর্ণাঙ্গ গঠন; ডানে-লম্বচ্ছেদ

MENINGES
Academic And Admission Care

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **দ্য হেরেলী ফেলিক্স** (d'Herelle Felix) এ ভাইরাসকে **ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায** নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী -Twort ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস তথা T_2 আবিষ্কার করেন। নিচে T_2 ফায এর বর্ণনা দেয়া হলো।

T_2 ব্যাকটেরিওফায সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। এর গঠন বেশ জটিল হলেও এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে জানা গেছে। এর দৈহিক গঠন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাঙাচি/শুক্রাণুর মতো। T_2 ফায-এর দেহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– **মাথা ও লেজ**।

মাথা (Head)

- মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির।
- এর বাইরের আবরণ দ্বিস্তরী প্রোটিন বা **ক্যাপসিড** (capsid) দিয়ে তৈরি।
- মাথার অভ্যন্তরে দ্বিসূত্রকবিশিষ্ট প্যাঁচানো DNA বিদ্যমান।
- মাথার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০ ন্যানোমিটার (nm) এবং প্রস্থ প্রায় ৬৫ ন্যানোমিটার (nm)।
- DNA তে প্রায় ১৫০টি জিন রয়েছে।

CamScanner

ঙ. গনিডিয়া (Gonidia) : কতগুলো ব্যাকটেরিয়ার প্রোটোপ্লাজম খন্ডিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্ল্যাজেলাযুক্ত গনিডিয়া বা গনিডিওস্পোর উৎপন্ন করে। মাতৃ-কোষেপ্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে গনিডিয়াগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে অপত্য ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে। *Leucothris*- জাতীয় সূত্রাকার ব্যাকটেরিয়া এভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

চ. অন্তঃরেণু বা এন্ডোস্পোর (Endospore) : প্রতিকূল পরিবেশে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটলে ব্যাকটেরিয়া অন্তরেণু বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টি করে বংশের বিস্তার ঘটায়। এ সময় ব্যাকটেরিয়া কোষের প্রোটোপ্লাস্ট সংকুচিত হয়ে গোল বা ডিম্বাকার ধারণ করে। এর চারদিকে একটি পুরু আবরণ তৈরি হলে তাকে **এণ্ডোস্পোর** বলে।

এণ্ডোস্পোরের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়াম কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। তাই একে বংশবৃদ্ধির উপায় হিসেবে বিবেচনা না করে বরং প্রতিকূলতা প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে **রেস্টিং স্পোর** (resting spore) নামে অবকাশকালীন স্পোর হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণত Bacillaceae গোত্রের ব্যাকটেরিয়া এন্ডোস্পোর উৎপন্ন করে থাকে।

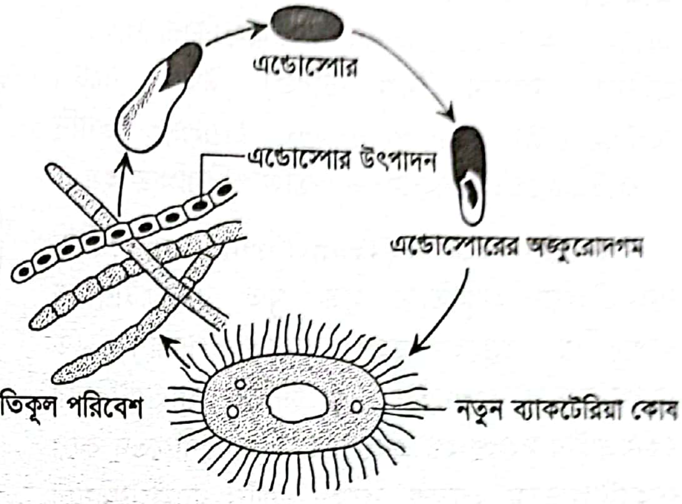

চিত্র ৪.২.৭ : এন্ডোস্পোরের মাধ্যমে অযৌন জনন

২. যৌন জনন এবং বংশগতীয় পুনর্বিন্যাস (Sexual Reproduction and Genetic Recombination)

প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন ঘটেনা। তবে বংশগতীয় বস্তু (genetic material) স্থানান্তর হয়। কোন একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ থেকে বংশগতীয় বস্তু (DNA) অন্য একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে যদি নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয় তখন তাকে **ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় পুনর্বিন্যাস** (genetic recombination of bacteria) বলে। এখানে গ্যামেট বা যৌন নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন, জাইগোট নিউক্লিয়াস (2n) দশার পরবর্তী পর্যায়ে মিয়োসিস বিভাজন ও হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস (n) সৃষ্টি প্রভৃতি দশাগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যৌন জনন ঘটেনা। উপরন্তু যৌন জননের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে জিনগত পুনঃসংযুক্তির কতিপয় অভিনব পন্থা ব্যাকটেরিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এরূপ জিনগত পুনঃসংযুক্তির অভিনব পন্থাগুলোকেই ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননের প্রকার বা ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

ক. সংশ্লেষ বা কনজুগেশন (Conjugation) : কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার দুটি কোষের সংস্পর্শের মাধ্যমে একটি কোষের **বংশগতীয় বস্তু** অন্য কোষে স্থানান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **কনজুগেশন** বলে। এ প্রকার যৌন জনন *E. coli* নামক ব্যাকটেরিয়ার কোষে বিজ্ঞানী **লেডারবার্গ** (Joshua Lederberg) এবং **ট্যাটাম** (Edward Tatum) ১৯৪৬ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এক্ষেত্রে একটি **গ্রাহক স্ত্রীকোষ** (recipient) ও উচ্চ উর্বরতাবিশিষ্ট **দাতা পুংকোষ** (donor) থেকে বংশগতীয় বস্তু (DNA) **সংশ্লেষ নালিপথ** (conjugation tube)-এর মাধ্যমে গ্রহণ করে। এখানে *E. coli* স্ট্রেইন দুটি ভিন্ন যৌনতার। এ স্ট্রেইন দুটির মধ্যে একটি বংশগতীয় বস্তু–DNA দাতারূপে (donor, +) এবং অপরটি বংশগতীয় বস্তু–DNA গ্রহিতারূপে (recipient, –) কাজ করে। দাতা কোষের বংশগতীয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই কোষ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে গ্রহীতা কোষটি দাতা কোষের বংশগতীয় বস্তুর অংশবিশেষ লাভ করে একটি আংশিক বা **অসম্পূর্ণ জাইগোট**-এ পরিণত হয়। এ ধরনের জাইগোট **মেরোজাইগোট** (merozygote) নামে পরিচিত। সংশ্লেষের শেষে দাতা কোষটি বিনষ্ট হয়।

MENINGES Academic And Admission Care
CamScanner

সাধারণত প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিওফাযে (T_2 ও ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস) কেবল DNA থাকে। অন্যদিকে উদ্ভিদ ভাইরাসে (TMV ও TIV ভাইরাস) কেবল RNA থাকে। অধিকাংশ ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক এবং RNA একসূত্রক বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

(খ) ক্যাপসিড (Capsid): ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডকে ঘিরে অবস্থিত প্রোটিন নির্মিত আবরণীকে ক্যাপসিড। এ আবরণীর প্রতিটি প্রোটিন অণুকে ক্যাপসোমিয়ার (capsomere) বলা হয়। এগুলো একেক ভাইরাসে একেক ধরনের হয়ে থাকে। ভাইরাসের ক্যাপসিড আবরণী অ্যান্টিজেনিক (antigenic) বৈশিষ্ট্যের। এটি ভেতরের নিউক্লিক অ্যাসিডকে প্রতিকূলতা হতে রক্ষা করে এবং পোষকদেহে সংক্রমণ ঘটাতে সাহায্য করে।

কোনো কোনো ভাইরাস যেমন- হার্পিস ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, HIV ইত্যাদিতে ক্যাপসিডের বাইরে দ্বিস্তর জৈব পদার্থ নির্মিত একটি অতিরিক্ত আবরণ দেখা যায়। এ আবরণটি সাধারণত লিপিড, লিপোপ্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। ভাইরাসের বহিঃস্থ আবরণের লিপিড বা লিপোপ্রোটিনের একককে পেপলোমিয়ার (peplomere) বলে। এ ধরনের লিপিড বা লিপোপ্রোটিনের আবরণযুক্ত ভাইরাসকে লিপোভাইরাস (lipovirus) বলে।

সাব ভাইরাল সত্ত্বা (Subviral agents)

নিম্নলিখিত সত্ত্বাসমূহ ভাইরাস থেকে আকারে ছোট কিন্তু ভাইরাসের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য বহন করে। এদেরকে সাব ভাইরাল সত্ত্বা বলে।

- ভিরিয়ন (Virion): ক্যাপসিড আবরণে আবৃত নিউক্লিক অ্যাসিডযুক্ত (DNA বা RNA) ও সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসকে ভিরিয়ন (virion) বলে। প্রতিটি ভিরিয়নে 2000-2130টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে। সংক্রমণক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে নিউক্লিওক্যাপসিড বলে।

- ভিরয়েড (Viroid): ভিরয়েড হলো কেবল RNA খণ্ডক নিয়ে গঠিত একটি সংক্রামক সত্ত্বা যারা ভাইরাসের মতো বিস্তারলাভ করতে এবং জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এগুলো ভাইরাস হতে অনেক ক্ষুদ্র এবং মাত্র কয়েকশত নিউক্লিওটাইড অণু নিয়ে গঠিত। ডাইনার ও রাইনার (T.D. Diener and W. S. Rayner) 1967 সালে ভিরয়েড আবিষ্কার করেন। ভিরয়েড উদ্ভিদের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। এরা গোলআলুর 'স্পিন্ডল টিউবার', নারকেলের 'ক্যাডাং ক্যাডাং' এবং অ্যাভোক্যাডোর 'সানবিচ' রোগ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের নিকট এদের দ্বারা প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টির কোনো প্রমাণ নেই, তবে এরা মানবদেহে 'হেপাটাইটিস ডি' রোগ সৃষ্টি করে বলে বর্তমানে ধারণা করা হয়।

- প্রিয়নস (Prions): ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন প্রোটিন আবরণকে প্রিয়ন (prion) বলে। এরা পোষক কোষের জিনোমে ঢুকে গিয়ে নতুন প্রিয়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং পোষকদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এরা ভাইরাস হতে ভিন্ন প্রকৃতির। স্ট্যানলি প্রুসিনার (Stanely B. Prusiner) 1982 সালে অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির এজীবাণু আবিষ্কার করেন। এজন্য তাঁকে 1997 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। প্রিয়নস দ্বারা প্রাণীর মস্তিষ্ক বা অন্য স্নায়ুকলা আক্রান্ত হয় যার কোন চিকিৎসা নেই এবং মৃত্যুর কারণ। এরা মানুষের কুরু রোগ (kuru), গরুর ম্যাড কাউ (mad cow) এবং ভেড়ার স্ক্র্যাপি (scrapie) রোগের জন্য দায়ী।

- স্যাটেলাইট (Satellite): স্যাটেলাইট হলো কেবল নিউক্লিক অ্যাসিড গঠিত সত্ত্বা যা পোষক কোষের মধ্যে অন্য একটি ভাইরাসের সাহায্যে অণুলিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম। যখন কোনো প্রোটিন আবরণ দ্বারা স্যাটেলাইট আবৃত হয় তখন তাকে স্যাটেলাইট ভাইরাস (satellite virus) বলে।

৪.২ টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV

তামাক পাতায় মোজাইক রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus=TMV) বলে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী ডিমিত্রি আইভানোভস্কি (Iwanowsky) 1892 সালে তামাক পাতার মোজাইক রোগের কারণ হিসেবে এক ধরনের বিষের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি একে ভাইরাস হিসেবে

MENINGES Academic And Admission Care
CamScanner

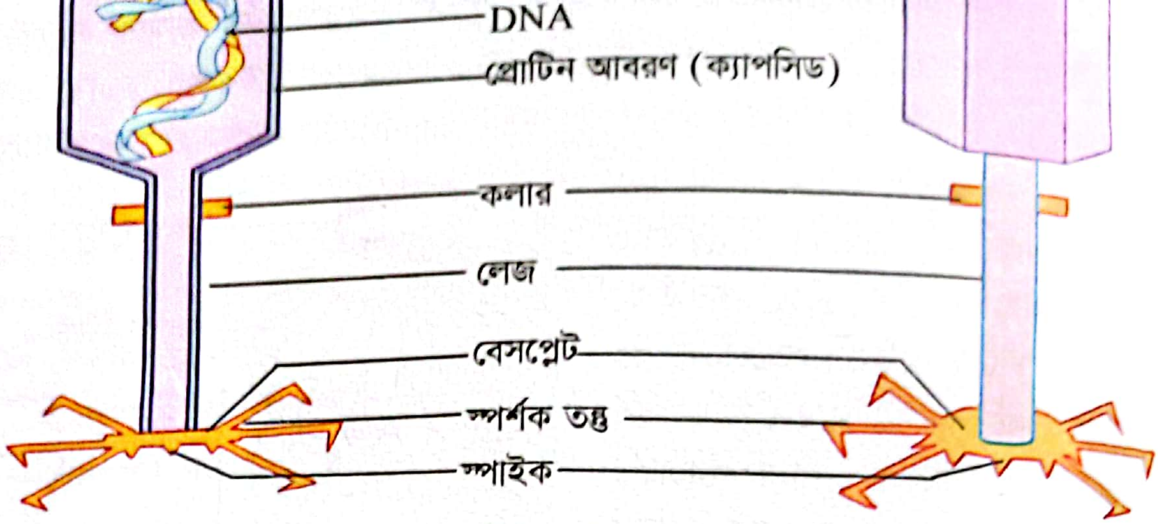

চিত্র: ৪.৪ T_2 ভাইরাস

ব্যাকটেরিওফায হলো এমন একটি ভাইরাস যা মানব বা প্রাণিকোষের কোনো ধরনের ক্ষতিকারক প্রভাব ছাড়া ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। এজন্য অনেকক্ষেত্রে এদেরকে সরসরি কিংবা অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে মিশ্রিত করে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণরোধে ব্যবহার করা হয়।

ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি

সকল ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবে ব্যাকটেরিওফায বা T_2 ভাইরাস সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। নির্দিষ্ট পোষক দেহ ব্যতিত ব্যাকটেরিওফায বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার দেহে T_2 ভাইরাসের দুই ধরনের বংশবৃদ্ধিসংঘটিত হয়, যথা-

১। লাইটিক চক্র (Lytic cycle) ও

২। লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic cycle)

MENINGES
Academic And Admission Care

লাইটিক চক্র (Lytic cycle)

যে পদ্ধতিতে ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করে বহুবিভাজিত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ করে নির্গত হয় তাকে **লাইটিক চক্র বা ভাইরুলেন্ট চক্র বা বিগলনকারী চক্র** বলে। T phages, T_2 phages, T_4 phages, T_6 phages ভাইরাস লাইটিক চক্রের মাধ্যমে *E. coli* (*Escherichia coli*) নামক ব্যাকটেরিয়ার কোষে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। লাইটিক চক্র নিম্নলিখিত পর্যায়গুলোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়:

১। **সংযুক্তি বা অ্যাডজরবশন** (Adsorption): স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে T_2 ফায ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের সুনির্দিষ্ট রিসেপটর সাইটে (receptor site) দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে আক্রমণের সূচনা ঘটায়।

২। **অনুপ্রবেশ বা পেনিট্রেশন** (Penetration): ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে অবস্থান গ্রহণের পর T_2 ফায ভাইরাসটি বিশেষ এনজাইমের দ্বারা পোষক দেহের কোষপ্রাচীরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি করে। ভাইরাসের লেজের প্রোটিন আবরণ সঙ্কোচিত হয় এবং লেজটি ব্যাকটেরিয়ার দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়। লেজের নলের মাধ্যমে ভাইরাসের DNA ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করে। ভাইরাসের ক্যাপসিড আবরণী বাইরে পরিত্যাক্ত হয়।

৩। **সংশ্লেষ বা সিনথেসিস** (Synthesis): T_2 ফায ভাইরাসের DNA পোষকদেহে প্রবেশের সাথে সাথে এটি ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং RNA পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটাইড, অ্যামিনো অ্যাসিড, রাইবোসোম, tRNA ইত্যাদি ব্যবহার করে নতুন ভাইরাস DNA ও ফায কোট প্রোটিন তৈরি করতে থাকে। ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ পোষক কোষের রাইবোসোমে সংঘটিত হয়।

CamScanner

৪.৫ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া হলো আবরণী বেষ্টিত নিউক্লিয়াস ও কোষীয় অঙ্গাণুবিহীন, জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট, ক্ষুদ্রতম সরল এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব। (একবচন-Bacterium, বহুবচন-Bacteria; ল্যাটিন শব্দ Bacterium cone=দণ্ড)। হল্যান্ডের বিজ্ঞানী ও অণুবীক্ষণযন্ত্রের আবিষ্কারক অ্যানটনি ফন লিউয়েন হুক (Antony V Leewenhoek) 1675 সালে সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন এবং এদের নাম দেন animalcule বা প্রাণী। জার্মান বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান গটফ্রিড এরেনবার্গ (Christian Gottfried Ehrenberg) 1829 সালে ক্ষুদ্রজীবদের *'ব্যাকটেরিয়া'* নামকরণ করেন। স্যা ডিলট (Se dillot) নামক একজন চিকিৎসক 1878 সালে ব্যাকটেরিয়াদের *'মাইক্রব'* বা *'অণুজীব'* হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, 1869) ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত বিখ্যাত **'germ theory of disease'** প্রকাশ করেন। জার্মান ডাক্তার রবার্ট কক (Robert Koch, 1843-1910) বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন প্রাণীর অনেক রোগের কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। তিনি যক্ষ্মা রোগের জন্য দায়ী *Mycobacterium tuberculosis* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন এবং এজন্য তাঁকে 1905 সালে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া ফ্যাক্টস

- ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীর আদিমতম জীব, এরা প্রায় 3.5 বিলিয়ন বছর যাবৎ পৃথিবীর সকল বাসস্থানে বিরাজ করে আছে।
- মাটি, পানি, বায়ু, অম্লীয় উষ্ণ প্রস্রবণ, পারমাণবিক বর্জ্য, মাটির গভীর স্তরে, মহাকাশ যানে, মৃত ও জীবিত জীবদেহ এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে।
- জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি ও পানিতে ব্যাকটেরিয়া অধিক ঘনত্বে থাকে। এক গ্রাম মাটিতে প্রায় 40 মিলিয়ন এবং এক মিলিলিটার মিঠা পানিতে প্রায় 1 মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে।
- মানবদেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে 10 গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে। মানুষের ত্বক ও অন্ত্রে সর্বাধিক ব্যাকটেরিয়া থাকে। মানুষের মুখ প্রায় 500 প্রজাতির ব্যকটেরিয়া বাস করে।
- মানবদেহে বিদ্যমান অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতি করে না বরং এরা দেহ সুস্থ রাখার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।
- পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ ননিলিয়ন (5×10^{30}) ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের সামগ্রিক জীবভর (biomass) সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবভর অপেক্ষা বেশি।
- ব্যাকটেরিয়া প্রচণ্ড শৈত্য (-17°C) বা উষ্ণতা (100°C) সহ্য করতে পারে। এরা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারে।
- অনেক ব্যাকটেরিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে এবং এদের দেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। অনেকে প্রাণীর অন্ত্রে মিথোজীবী হিসেবে বাস করে।
- ধারণা করা হয় কোষের শক্তিঘর হিসেবে পরিচিত মাইটোকন্ড্রিয়া ব্যাকটেরিয়া হতে সৃষ্ট যা কয়েক বিলিয়ন বছর পূর্বে কোষে পরজীবী হিসেবে প্রবেশ করেছিল।
- মানবদেহে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ সবচেয়ে বিপদজনক এবং এরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর প্রায় দুই মিলিয়ন লোক মারা যায়। আমেরিকাতে AIDS সংক্রমণে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে।

ব্যাকটেরিওলজি (Bacteriology): বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়ার শনাক্তকরণ, গঠন, আবাস, বংশবিস্তার ... আলোচনা করা হয় তাকে ব্যাকটেরিওলজি বলে।

MENINGES
Academic And Admission Care
CamScanner

সাইটোপ্লাজম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গোলাকার গঠন তৈরি করে। এসব গোলাকার গঠনগুলোকে গনিডিয়া (বহুবচন-Gonidia, একবচন-Gonidium) বলে। গনিডিয়াগুলো পরিপক্ক হলে মাতৃকোষের প্রাচীর ফেটে যায় এবং গনিডিয়াগুলো মুক্ত হয়। অনুকূল পরিবেশে প্রতিটি গনিডিয়াম এক একটি অপত্য ব্যাকটেরিয়াম সৃষ্টি করে।

(গ) এন্ডোস্পোর সৃষ্টি দ্বারা (By formation of Endospore): প্রতিকূল পরিবেশে অনেক গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া (*Bacillus* and *Clostridium*) কোষের ভেতরে একটি **অন্তঃরেণু** বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টি করে। এসময় ব্যাকটেরিয়ামের সমুদয় প্রোটোপ্লাস্ট একত্রিত হয়ে গোলাকার বা ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার গঠন তৈরি করে। অনুকূল পরিবেশে এন্ডোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে অপত্য ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না বলে অনেকেই একে প্রজনন হিসেবে গণ্য করেন না।

৩। যৌন জনন (Sexual reproduction): বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ব্যাকটেরিয়াতে কোনো যৌন জনন ঘটে না। কিন্তু 1946 সালে বিজ্ঞানী লেডারবাগ ও টাটাম (Lederberg and Tatum) এর গবেষণায় সর্বপ্রথম *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ামের যৌন জনন আবিষ্কৃত হয়। তবে এক্ষেত্রে যৌন জনন পদ্ধতিতে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না। **জেনেটিক বস্তুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে** ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন সম্পন্ন হয়। ব্যাকটেরিয়ার এ বিশেষ ধরনের যৌন জনন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী লেডারবাগ ও টাটাম-কে 1958 সালে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কোনো একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষের জেনেটিক বস্তু অন্য কোনো একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষে স্থানান্তরের ফলে যখন নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়াম সৃষ্টি হয় তখন তাকে **জেনেটিক পুনর্বিন্যাস** (Genetic recombination) বলে। জেনেটিক বস্তুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিপাকীয় কার্যাবলি ত্বরান্বিত হয়। তিনটি ভিন্ন উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তুর পুনর্বিন্যাস হতে দেখা যায়, যথা-

MENINGES
Academic And Admission Care

(ক) কনজুগেশন (Conjugation): কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার দুটি কোষের সংস্পর্শের মাধ্যমে একটি কোষের নিউক্লিয় বস্তু অন্য কোষে স্থানান্তর হয়। এ প্রক্রিয়াকে কনজুগেশন বলে। 1946 সালে লেডারবাগ ও টাটাম ব্যাকটেরিয়াতে কনজুগেশন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

(খ) ট্রান্সডাকশন (Transduction): ফায ভাইরাস বা ব্যাকটেরিওফাযের মাধ্যমে নিউক্লিয় বস্তু এক ব্যাকটেরিয়া হতে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে **ট্রান্সডাকশন** বলে। 1952 সালে **জিনডার ও লেডারবাগ** (Zinder and Lenderberg) নামক দুজন বিজ্ঞানী *Salmonella* ব্যাকটেরিয়াতে ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

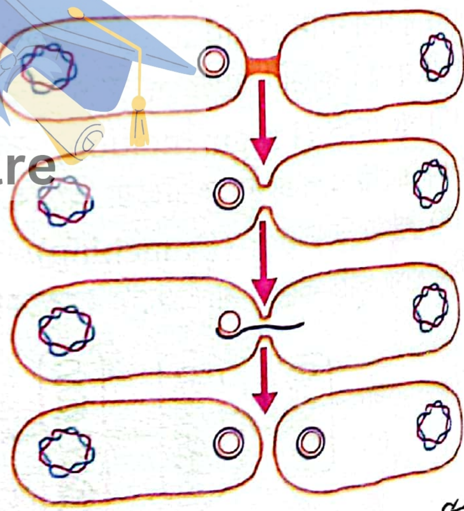

চিত্র ৪.১৭ ব্যাকটেরিয়র জেনেটিক পুনর্বিন্যাস

(গ) ট্রান্সফরমেশন (Transformation): কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে মুক্ত মৃত ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে। মৃত ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তু জীবিত ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর সংলগ্ন হয় এবং প্লাজমা আবরণী ভেদ করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। এটি ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তুর সাথে পুনর্বিন্যস্ত হয়। ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তুর এ ধরনের পুনর্বিন্যাসকে **ট্রান্সফরমেশন** বলে।

ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব

মানবজীবনে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বদা ব্যাকটেরিয়া ভীতি কাজ করে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার অপকারের চেয়ে উপকারের পাল্লা অনেক ভারী। এরা মানুষের অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে

৫। জমিতে পানি সেচের সময় উহার সঙ্গে জিঙ্ক সালফেট (2%) ও ব্লিচিং পাউডার (100μg/ml) ব্যবহার করতে হবে।

৬। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে। PSB Rc82 জাতের ধান ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী যা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় এবং প্রতি ফসলে প্রায় 0.8 মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করা হয়। 2019 সালে জিন প্রযুক্তি মাধ্যমে Xa4, xa5, xa13, Xa21, Xa33, Xa38 জাতের ধানগুলো সৃষ্টি করা হয় যেগুলো অধিক ফলনশীল এবং ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী।

২। কলেরা (Cholera)

কলেরা একটি পানিবাহিত সংক্রমক রোগ যার ফলে তীব্র ডায়োরিয়াসহ দেহে পানি শূণ্যতা দেখা দেয় এবং চিকিৎসা না নিলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশেই এরোগের প্রকোপ বেশি পরিলক্ষিত হয়। একসময় এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কলেরা রোগ মহামারি আকারে দেখা দিতো এবং চিকিৎসার অভাবে 50% লোক মারা যেতো। বর্তমানে খাবার স্যালাইন আবিষ্কার হওয়ায় এরোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। তারপরও বিশ্বে প্রতিবছর 3 থেকে 5 মিলিয়ন মানুষ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় 0.1 মিলিয়ন মানুষ এরোগে মৃত্যুবরণ করে। দুর্বল পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অধিক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে কলেরার প্রকোপ বেড়ে যায়। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে কলেরা রোগের নাম ওলাউঠা (olauta) যার অর্থ হচ্ছে ঘন ঘন পায়খানা ও বমি করা।

রোগের কারণ: *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে কলেরা রোগ হয়। *V. cholerae* একটি গ্রাম নেগেটিভ, সুবিধাবাদী অবায়বীয় এবং কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। ফেলিক্স আর্কিমেডি পোচেট (Félix-Archimède Pouchet) 1849 সালে সর্বপ্রথম এ ব্যাকটেরিয়ার বিবরণ দেন।

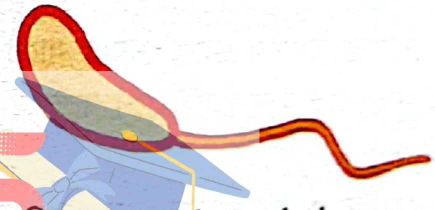
চিত্র ৪.১৯ *Vibrio cholerae*

MENINGES
Academic And Admission Care

V. cholerae ব্যাকটেরিয়ার দেহের এক প্রান্তে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে এবং কোষ আবরনীতে অসংখ্য পিলি (pili) থাকে। যদিও এ ব্যাকটেরিয়ার 200 অধিক সেরোটাইপ আছে কেবল O_1 ও O_{139} কলেরা মহামারির জন্য দায়ী। *V. cholerae* ব্যাকটেরিয়াতে দুটি বৃত্তাকার DNA থাকে যাদের মধ্যে একটি DNA কলেরা টক্সিন (cholera toxin-CT)) নামক প্রোটিন সৃষ্টি করে। এ কলেরা টক্সিনই কলেরা রোগের প্রধান কারণ।

রোগের সংক্রমণ: কলেরা জীবাণু দ্বারা দূষিত খাবার গ্রহণ অথবা পানি পান করলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। কলেরা মহামারি উপদ্রুত অঞ্চলে রোগীর মলমূত্রের মাধ্যমেও এরোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেসব অঞ্চলে পয়োঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির যথাযথ ব্যবস্থা নেই সেসব অঞ্চলে কলেরা দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং নোনাপানির নদ-নদীতে কলেরার জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া কঠিনাস্থি মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক ও চিংড়ির মধ্যেও কলেরা জীবাণু বেঁচে থাকে এবং তা কলেরার উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। কলেরা আক্রান্ত রোগীর সাথে সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শে এরোগের সংক্রমণ ঘটে না। তাই রোগীর সেবাদানকারী ব্যক্তিদের সংস্পর্শজনিত সংক্রমণের কোনো ঝুঁকি থাকে না।

প্রাথমিক অবস্থায় কলেরা জীবাণু দেহে প্রবেশ করার পর ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসার সাথে লেগে যায়। এখানে এরা এন্টেরোটক্সিন (enterotoxin) বা কলেরাজেন (choleragen) নামক এক প্রকার বিষাক্ত টক্সিন পদার্থ নিঃসরণ করে। এর ক্রিয়ায় অন্ত্রের প্রাচীরের আবরণী কলা থেকে অধিক পরিমাণ ক্লোরাইড ও পানি চোয়াতে থাকে যা পাতলা পানির মতো পায়খানারূপে দেহ হতে বের হয়ে যায়।

রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

অনেকসময় আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায় না। দু-তিন দিন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ দিন পরও রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

... পানির মতো পাতলা পায়খানা (rice-water

CamScanner

ম্যালেরিয়া মহামারি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) 2015 সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় 214 মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং প্রায় 4.3 মিলিয়নের অধিক মানুষ এরোগে মৃত্যুবরণ করে। এর অধিকাংশ (65%) আক্রান্ত হয় 15 বছর বয়সের কম শিশুরা। আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিষবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া মহামারি আকারে দেখা দেয়। George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy সহ কমপক্ষে 8 জন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে বিশ্বের প্রায় 100টি দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই এরোগের ঝুঁকিতে আছে। ম্যালেরিয়া বাংলাদের মানুষের নিকট অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যগত সমস্যা। বাংলাদেশের 64টি জেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের 5টি জেলা ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। খ্রিস্টপূর্ব 2700 অব্দের শুরুতে চীনদেশে এটি 'অনুপম পর্যাবৃত জ্বর' (unique periodic fevers) হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিলো। এরোগ মহামারি আকারে দেখা দিতো এবং এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহাণি ঘটতো। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য এরোগের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো বলে একে 'রোমান জ্বর' বলা হতো। মধ্যযুগে একে 'জলা জ্বর' বা '*marsh fever*' বলা হতো। Malaria শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী টর্টি (Torti, 1753)। ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য এ শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানী ম্যাকুলোচ (Macculoach, 1827)। তখন মানুষের ধারণা ছিল জলাশয় থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু সেবনে (ইতালিয় *mal* = দূষিত + *aria* = বায়ু) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভারতের কলিকাতার প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে কর্মরত ইংরেজ ডাক্তার স্যার রোনাল্ড রস (Sir Ronald Ross) 1897 সালে প্রমাণ করেন যে *Anopheles* গণের মশকী মানবদেহ হতে রক্তের সাথে ম্যালেরিয়ার পরজীবী শোষণ করে এবং পরবর্তীতে অন্য মানুষের দেহে স্থানান্তর করে। এছাড়া তিনি *Anopheles* মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর সম্পূর্ণ জীবন-চক্র আবিষ্কার করেন। এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাঁকে 1902 সালে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

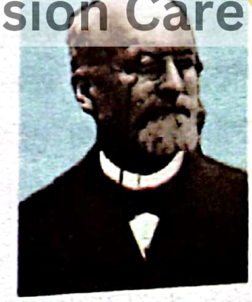
Charles Laveran
(1845-1922)

Sir Ronald Ross
(1857 –1932)

ফরাসি সেনাবাহিনীর ডাক্তার চার্লস ল্যাভেরান (Charles Laveran) 1880 সালে সর্বপ্রথম আলজেরিয়ার সামরিক হাসপাতালে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত রক্তকণিকা থেকে ম্যালেরিয়ার প্রোটোজোয়ান পরজীবী আবিষ্কার করেন এবং এর নাম দেন *Oscillaria malariae* যা পরবর্তীতে *Plasmodium* দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। এ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে 1907 সালে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

ম্যালেরিয়া পরজীবীর শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান
(Systematic Position of malarial parasite)

Meglitsch ও **Schram** (1991) অনুসরণে ম্যালেরিয়া পরজীবী *Plasmodium vivax*-এর শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান নিম্নরূপ

Kingdom	: Protista
Sub kingdom	: Protozoa
Phylum	: Apicomplexa
Class	: Sporozoa
Order	: Haemosporidia
Family	: Plasmodiidae
Genus	: *Plasmodium*
Species	: *Plasmodium vivax*

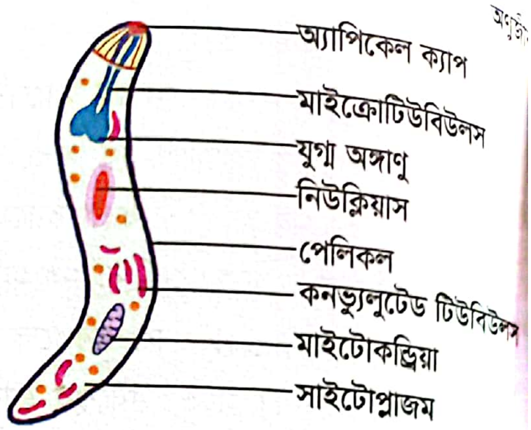

Plasmodium জীবাণু

Plasmodium গণের 60 প্রজাতির মধ্যে মাত্র 4 প্রজাতির পরজীবী মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। নি এদের বিস্তৃতি, সৃষ্ট রোগের নাম ও জ্বরের প্রকৃতি উল্লেখ করা হলো-

পরজীবীর নাম	বিস্তৃতি	সৃষ্ট রোগের নাম	জ্বরের প্রকৃতি
P. vivax	নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	বিনাইন টারসিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
P. ovale	গ্রীষ্মপ্রধান ও উপ-গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	মাইল্ড টারসিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
P. malariae	নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	কোয়ারটান ম্যালেরিয়া	72 ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে
P. falciparum	গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল	ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া	36-48 ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে

Plasmodium malariae ও *Plasmodium ovale* প্রজাতির ম্যালেরিয়া পরজীবী বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

MENINGES
Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়া পরজীবীর পোষক

ম্যালেরিয়া পরজীবীর দুটি পোষক, মানুষ এবং *Anopheles* মশকী। মানুষকে এদের মুখ্য বা প্রাথমিক পোষক হিসেবে এবং মশকীকে গৌণ বা মাধ্যমিক পোষক বা বাহক (ভেক্টর) হিসেবে গণ্য করা হয়।

পৃথিবীতে *Anopheles* গণের অন্তর্ভুক্ত প্রায় 430 প্রজাতির মশার মধ্যে 19 প্রজাতির মশা ম্যালেরিয়া রোগের ভেক্টর বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে 34 প্রজাতির *Anopheles* পাওয়া যায় যাদের মধ্যে 8 প্রজাতি ম্যালেরিয়ার ভেক্টর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *A. dirus, A. aconitus, A. annularis, A. philippnensis, A. sundaicus* ইত্যাদি।

চিত্র ৪.২০: *Anopheles* মশকী

- **কেবল স্ত্রী *Anopheles* মশকীর মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া ছড়ায়**

কেবল স্ত্রী *Anopheles* মশকীর মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া ছড়ায় কারণ স্ত্রী *Anopheles* মশকীর বিদ্ধকারী ও চোষক ধরনের (piercing and sucking) মুখোপাঙ্গ থাকে যা মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ বিদ্ধ করে খাদ্য হিসেবে রক্ত গ্রহণ করে যা তাদের ডিমের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও পরিস্ফুটনের জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে পুরুষ *Anopheles* মশার ম্যাক্সিলারি পাল্পের (maxillary palps) শেষাংশ ভোঁতা প্রকৃতির এবং ম্যান্ডিবল অনুপস্থিত বিধায় এরা কোনো মেরুদণ্ডীর ত্বক বিদ্ধ করতে পারে না। এছাড়া পুরুষের হাইপোফ্যারিংক্স (hypopharynx) ল্যাবিয়ামের (labium) সাথে যুক্ত থাকায় এদের প্রবোসিস (proboscis) রক্তপানে অক্ষম কিন্তু উদ্ভিদের রস ও ফুলের নেকটার গ্রহণে সক্ষম।

- ***Culex* ও *Aedes* মশকী ম্যালেরিয়া ছড়ায় না**

Culex ও *Aedes* মশকী মানুষের রক্ত পান করলেও এরা ম্যালেরিয়া ছড়ায় না। কারণ এসব মশকীর পরিপাক রসে বিশেষ ধরনের এনজাইম থাকে যা ম্যালেরিয়া পরজীবীর গ্যামিটোসাইটগুলোকে হজম করে ফেলে।

CamScanner

মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে স্পোরোজোয়াইট থেকে ক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট সৃষ্টি পর্যন্ত পর্যায়কে সাইজোগনি বা অযৌন প্রজননকে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।

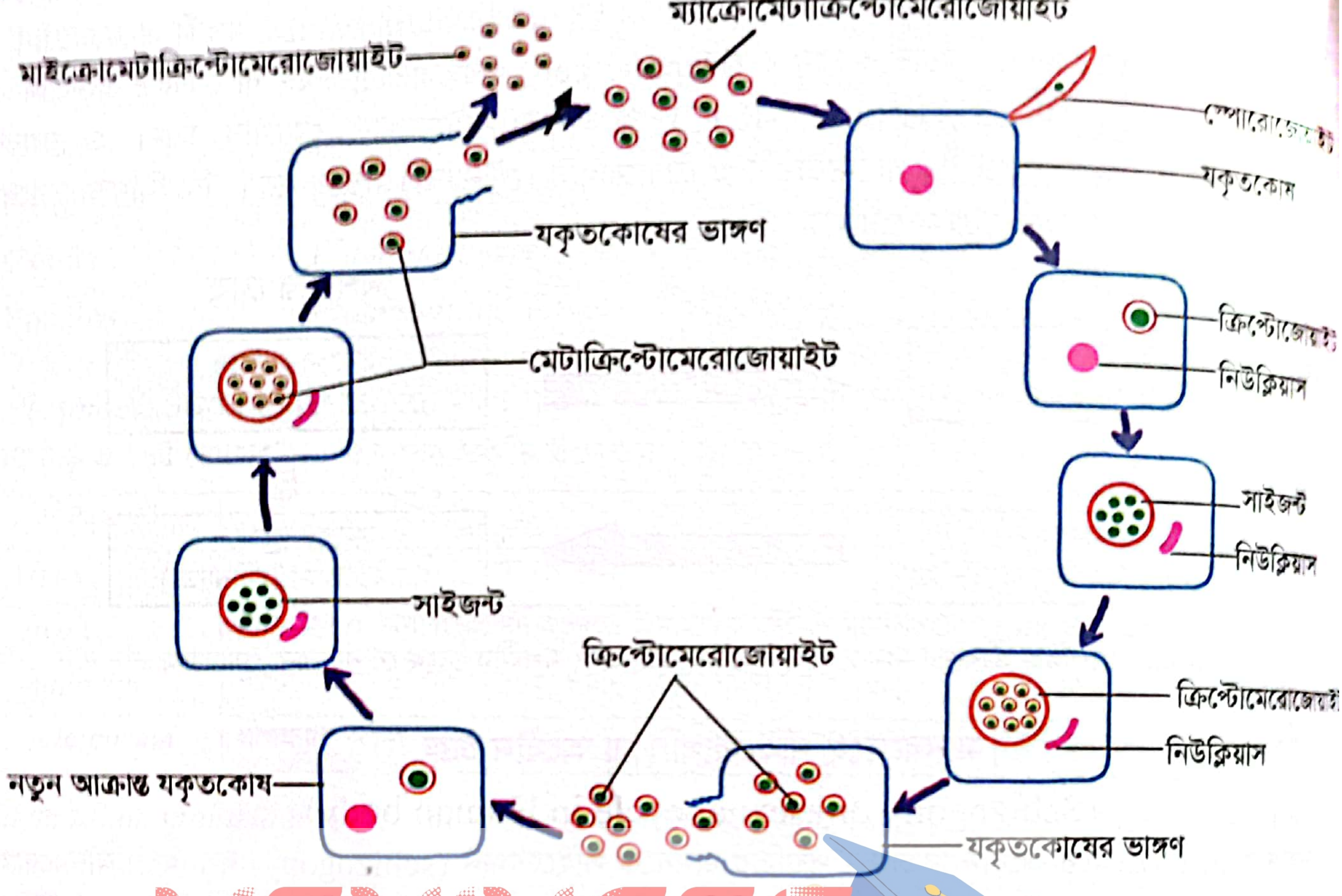

চিত্র ৪.২২ ম্যালেরিয়া পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্র

MENINGES
Academic And Admission Care

৫। মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট (Metacryptomerozoite): ক্রিপ্টোমেরোজোয়াইটগুলো সাইনোসয়েড থেকে নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণ করে এবং খাদ্যগ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরা পুনরায় সাইজন্ট দশার মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য জীবাণুর সৃষ্টি করে। এদের মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট বা ফ্যানেরোজোয়াইট বলে। এগুলো বার বার নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণ করে এবং একই প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অসংখ্য মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট সৃষ্টি করে। উৎপন্ন মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়েটের মধ্যে কিছুসংখ্যক আকারে বড় হয়ে ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট এবং কিছুসংখ্যক ছোট হয়ে মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট উৎপাদন করে। ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইটগুলো পুনরায় যকৃতকোষকে আক্রমণ করে কিন্তু মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইটগুলো লোহিত রক্তকণিকাকে (RBC) আক্রমণ করে।

মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে ক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট থেকে মাইক্রো ও ম্যাক্রো মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনি বা অযৌন প্রজননকে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।

(খ) এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্তকণিকায় অযৌন চক্র (Erythrocytic schizogony)

স্পোরোজোয়াইট দশা মানবদেহে প্রবেশের পর ম্যালেরিয়া পরজীবীর রক্তে আত্মপ্রকাশ করতে 7-8 দিন সময় লাগে। এ সময়কে প্রি-পেটেন্ট কাল (pre-patent period) বলে। অনেকসময় স্পোরোজোয়াইট যকৃতকোষে প্রবেশের পর এটি বিভাজিত না হয়ে সুপ্তাবস্থায় থাকে। কয়েক মাস বা বছর পরও এরা বিভাজিত হয়ে মেরোজোয়াইট সৃষ্টি করতে পারে। ম্যালেরিয়া পরজীবীর এ ধরনের সুপ্ত স্পোরোজোয়াইটদের হিপনোজোয়াইট (hypnozoite) বলে। হেপাটিক সাইজোগনিতে সৃষ্ট মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজোয়াইট রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করার মাধ্যমে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি শুরু হয়। এতে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে দেখা যায়-

CamScanner

২। আক্রান্ত রোগীর যকৃত ও প্লীহা স্ফীত হয়ে যায়, ফলে এগুলো থেকে রক্তকণিকা উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩। আক্রান্ত প্লীহা থেকে lysolecithin নামক এক ধরনের বিশ্লেষী পদার্থ নিঃসৃত হয় যাহা RBC কে ধ্বংস করে।

৪। পরজীবী heamolysin নামক এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা স্বাভাবিক অনাক্রান্ত RBC কে ধ্বংস করে।

৫। রোগীর খাবার গ্রহণে বিস্বাদ ও অরুচি আসাতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় না।

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ/উপসর্গসমূহ

মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সংক্রমণের 2-3 সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ বা উপসর্গসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে–

১। বমির উদ্রেক, ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, আহারে অনীহা এবং অনিদ্রা দেখা দেয়।

২। মাথা ব্যথা, পেশির ব্যথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা এবং শীত শীত ভাব অনুভূত হয়।

(খ) রোগের মাধ্যমিক পর্যায়ে–

১। প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে 48 ঘণ্টা অন্তর অন্তর জ্বর আসে।

২। জ্বর 3-4 ঘণ্টা স্থায়ী হয় এবং জ্বর ছাড়ার সময় শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়।

৩। জ্বরের সময় শরীরের তাপমাত্রা 103-104°F পর্যন্ত হয় কিন্তু জ্বর ছাড়ার পর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

(গ) রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে–

১। রোগীর প্লীহা ও যকৃত অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়ে যায়।

২। রোগীর খাদ্য পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে, রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং রোগী দুর্বল হয়ে অবশেষে মারা যায়।

MENINGES
Academic And Admission Care

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা উচিত সেগুলো হলো:

১। মশা নিয়ন্ত্রণ (Mosquitoes control)

Anopheles মশকী ম্যালেরিয়ার পরজীবীর ভেক্টর বা বাহক পোষক। এদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে সফলভাবে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

(i) মশার প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ যেমন–বদ্ধ ও পচা পানিযুক্ত ডোবা-নালা ইত্যাদি ভরাট করা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা, খোলা ড্রেন ঢেকে দেয়া, কাঁচা পায়খানা অপসারণ করা।

(ii) দংশন উদ্যত মশাকে হাত দিয়ে মেরে ফেলা, বিভিন্ন ফাঁদ পেতে পূর্ণাঙ্গ মশা ধরা।

(iii) যেসব জলাশয়ে মশার লার্ভা ও পিউপা দেখা যায় সেগুলোতে বিভিন্ন লার্ভা খাদক মাছ যেমন–কৈ, শিং, গাপ্পি, মাগুর, খলসে, তেলাপিয়া ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া।

(iv) *Bacillus thuringiensis* H-14 ও *B. sphaericus* ব্যাকটেরিয়ার দেহে বিদ্যমান মারণ জিন ব্যবহার করে জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে বায়োপেস্টিসাইড তৈরি করে জলাশয়ে প্রয়োগ করে মশার লার্ভা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা যায়।

(v) এছাড়া গামা বিকিরণ, রাসায়নিক পদার্থ ও হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে বন্ধ্যা মশা উৎপাদন করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করলে মশার পপুলেশন হ্রাস পায়।

(vi) শহর এলাকাতে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা।

CamScanner

- **নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid):** ভাইরাসে ক্যাপসিডের ভেতরের অংশকে মজ্জা (Core) বলে যা শুধুমাত্র যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। উদ্ভিদ ভাইরাসে সাধারণত এক সূত্রক RNA (TMV) এবং ফায ও প্রাণী ভাইরাসে সাধারণত দ্বিসূত্রক DNA থাকে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে দ্বিসূত্রক RNA (reovirus) এবং এক সূত্রক DNA (কোলিফাজ) থাকে। ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড এক বা একাধিক (HIV) টুকরা নিয়ে গঠিত। আবৃত ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ গঠন তৈরি করে যাকে **নিউক্লিওক্যাপসিড** (nucleocapsid) বলে। যেমন– HIV।

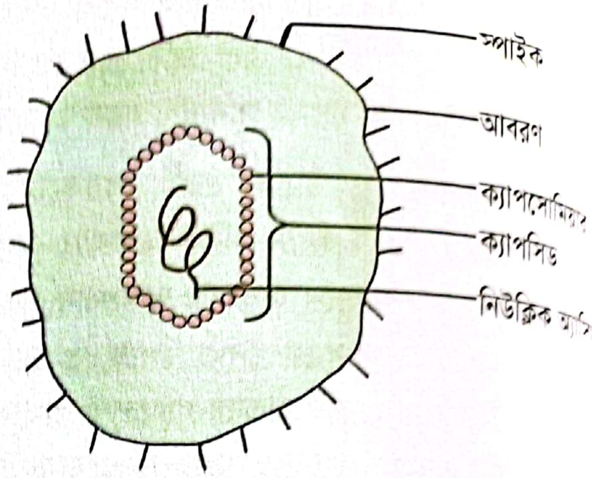

চিত্র-৪.১: ভাইরাসের সাধারণ গঠন

- **অন্তঃদ্রব্য (Inner Substance):** কোনো কোনো ভাইরাসে লিপিড, পলিস্যাকারাইড, তামা, বায়োটিন এবং এনজাই থাকে। যেমন- ব্যাকটেরিওফাযে লাইসোজাইম, আবার HIV-তে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইম থাকে। তাই এ RNA থেকে DNA সংশ্লেষ করতে পারে (রিট্রোভাইরাস)।

৪.১.৩ ভাইরাসের প্রকারভেদ (Types of Virus)

গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাইরাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়—

১. **আকৃতি অনুযায়ী:** ভাইরাসকে আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. **গোলাকার (Spherical):** এরা দেখতে অনেকটা গোলাকার। উদাহরণ- পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

ii. **ডিম্বাকার (Oval Shaped):** এই ধরনের ভাইরাসগুলো অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

> **জেনে রাখো**
>
> **ভিরিয়ন:** নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন বলে। সংক্রমন ক্ষমতা বিহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিওক্যাপসিড।

MENINGES
Academic And Admission Care

iii. **দণ্ডাকার (Rod Shaped):** এরা দেখতে অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ- আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস, টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV)।

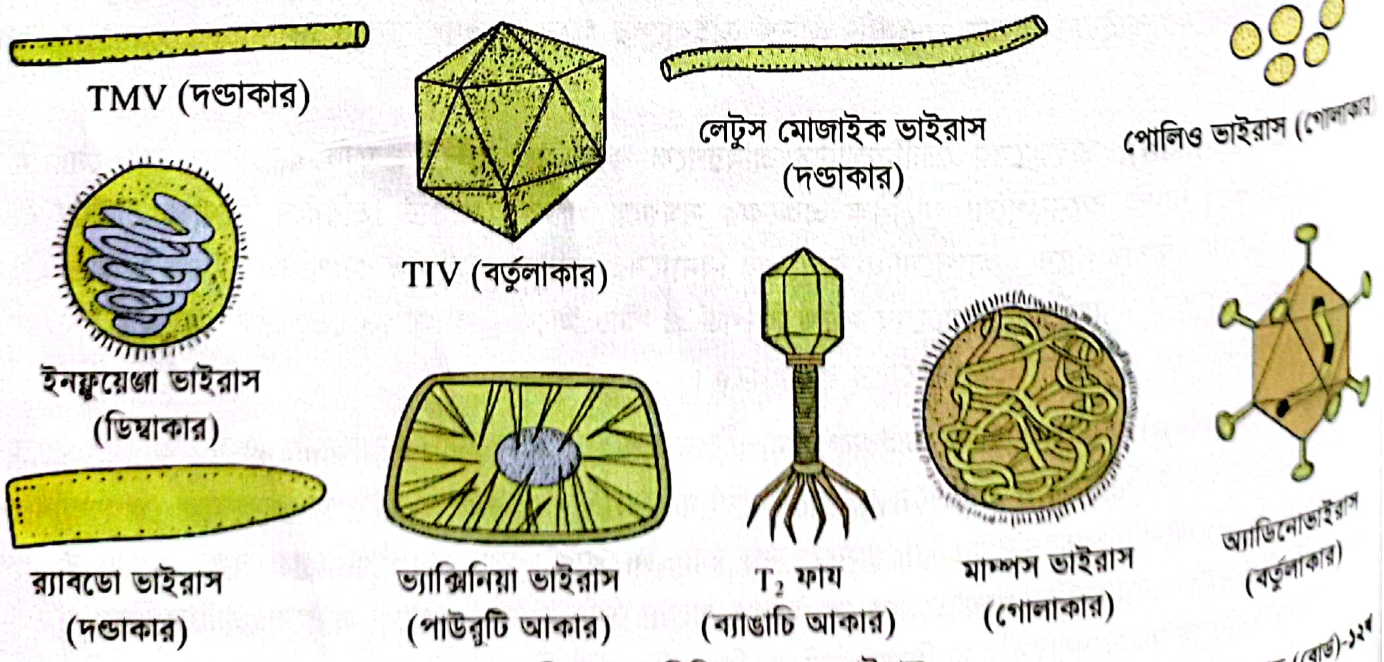

চিত্র-৪.২: বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস

CamScanner

৫. পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে।
৬. অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা করলে বীজতলায় পানি কম জমবে, চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।
৭. নাইট্রোজেন সার এর ব্যবহার কমাতে হবে।
৮. ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
৯. এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরিয়ে জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
১০. বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
১১. ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়। কারণ বীজ রোগ-জীবাণুর প্রধান বাহন।
১২. বীজ বপনের বা চারা রোপনের পূর্বে জমিকে উত্তমরূপে শুকাতে হবে প্রয়োজনে জমির শুকনা আবর্জনা বা খড় পুড়িয়ে দিতে হবে।

বাড়ির কাজ

নিকটস্থ ধানক্ষেত থেকে ব্লাইট আক্রান্ত ধান গাছের নমুনা সংগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ এবং তা পাঠ্য বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।

পাঠ ১২ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ: কলেরা
Bacterial Disease: Cholera

MENINGES
Academic And Admission Care

৪.১২ কলেরা (Cholera)

কলেরা পানি ও খাদ্যবাহিত একটি সংক্রামক রোগ যা অত্যন্ত মারাত্মক। সুচিকিৎসার সাহায্যে রোগটি সহজেই নিরাময় করা যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করলে রোগ মুক্ত থাকা যায়। বিশ্বে প্রতি বছর ১,০০,০০০ লোক এ রোগের কারণে মারা যায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও এ রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। এর কারণ হিসেবে ১৯৬৬ হতে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বায়োটাইপ-*Vibrio cholerae* O1 এবং ১৯৯৩ সালে সেরোটাইপ-*V. cholerae* O139-কে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে সেগুলো বাংলাদেশে অনুপস্থিত। বিভিন্ন ধরনের কলেরার মধ্যে **এশিয়াটিক কলেরা সবচেয়ে মারাত্মক।**

চিত্র-৪.১৯: কলেরা জীবাণু

৪.১২.১ রোগের কারণ (Reason)

Vibrio cholerae নামক গ্রাম নেগেটিভ, কমাকৃতির ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। এর দৈর্ঘ্য ১-৫ মাইক্রন, প্রস্থ ০.৪-০.৬ মাইক্রন এবং একক ফ্লাজেলাযুক্ত (monotrichous)। রোগীর মল বা বমি দিয়ে জীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং খাদ্য বা পানি গ্রহণের ফলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। রোগজীবাণু অন্ত্রে প্রবেশের ১-৫ দিনের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। রবার্ট কচ সর্বপ্রথম কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

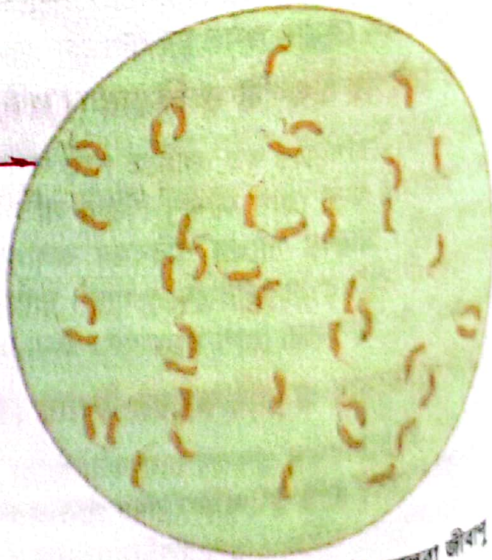

চিত্র-৪.২০: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট কলেরা জীবাণু

CamScanner

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া এককোষী প্রোক্যারিওটিক জীব। এদের আকৃতি গোলাকার, দণ্ডাকার, কমাকৃতি বা বক্রদণ্ডের ন্যায়, তবে অনেক ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি পরিবেশের উপর পরিবর্তনশীল। দ্বিবিভাজন বা মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় এদের অযৌন জনন ঘটে। অনেক পরজীবী ব্যাকটেরিয়া মানুষসহ উদ্ভিদ, প্রাণিদেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

প্লাজমোডিয়াম

Plasmodium গণের প্রোটোজোয়া মানুষের ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এন্ডেমিক রোগ। প্লাজমোডিয়াম এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষক প্রাণীর প্রয়োজন হয়। মানুষের দেহে অযৌন ও মশকীর দেহে এদের যৌনচক্র সম্পন্ন হয়। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ রোধ করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পার্থক্যসমূহ

▶ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয়; এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয়; এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস আছে।
ii. এরা অতি আণুবীক্ষণিক।	ii. এরা আণুবীক্ষণিক।
iii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	iii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iv. কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	iv. কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
v. এতে বিপাক ক্রিয়া দেখা যায় না এবং কোনো এনজাইমও নেই।	v. এদের বিপাক ক্রিয়ার জন্য এনজাইম আছে।
vi. এদের DNA অথবা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে।	vi. এদের DNA এবং RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড একই সাথে থাকে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

▶ লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
i. লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সমগ্র ভাইরাস সৃষ্টি হয়।	i. লাইসোজেনিক চক্রে ভাইরাল DNA অণুর প্রতিলিপি গঠিত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভাইরাস সৃষ্টি হয় না।
ii. পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষের দ্রুত বিদারণ ঘটে।	ii. পোষক ব্যাকটেরিয়ার বিদারণ ঘটে না।
iii. আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভাইরুলেন্ট (virulent)।	iii. পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পারেট (temperate)।
iv. এ চক্রে পোষক DNA বিনষ্ট হয়।	iv. এ চক্রে পোষক DNA এর সাথে যুক্ত হয়েই পোষক DNA এর সাথে সাথে ভাইরাস DNA এর প্রতিলিপি তৈরি হয়।
v. প্রোফায তৈরি হয় না।	v. প্রোফায তৈরি হয়।
vi. ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক রিকম্বিনেশনে কোনো ভূমিকা নেই।	vi. ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক রিকম্বিনেশনে ভূমিকা রাখে।

MENINGES
Academic And Admission Care

CamScanner

▶ RNA ভাইরাস ও DNA ভাইরাস এর মধ্যে পার্থক্য

RNA ভাইরাস	DNA ভাইরাস
i. সাধারণত দণ্ডাকার বা সূত্রাকার।	i. সাধারণত গোলাকার, বহুভুজাকার, ব্যাঙাচি আকার ও পাউরুটি আকৃতির।
ii. অধিকাংশ RNA ভাইরাস উদ্ভিদ ও সায়ানোফাযকে আক্রমণ করে।	ii. অধিকাংশ DNA ভাইরাস প্রাণী ও ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে।
iii. অধিকাংশ ভাইরাসের RNA একসূত্রক।	iii. অধিকাংশ ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক।
iv. এরা সাধারণত উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে।	iv. এরা সাধারণত প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে।
v. সাধারণত এনভেলপ থাকে না।	v. ক্যাপসিডের বাইরে সাধারণত এনভেলপ থাকে।
vi. এরা বাহক পতঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতস্থানের মাধ্যমে পোষক কোষে প্রবেশ করে।	vi. এরা সাধারণত এন্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় পোষক কোষে প্রবেশ করে।

▶ ফ্ল্যাজেলা ও পিলির মধ্যে পার্থক্য

ফ্ল্যাজেলা	পিলি
i. কোষ প্রাচীরের ভিতরের পাদদেশীয় গ্রানিউল থেকে ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি হয়।	i. কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পিলি সৃষ্টি হয়।
ii. পিলি অপেক্ষা আকারে বড় এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল।	ii. ফ্ল্যাজেলা অপেক্ষা খাটো ও অধিকতর সরু।
iii. সূত্রাকার লম্বা অঙ্গাবিশেষ যা Blapheroplast নামক দানা হতে উৎপন্ন হয় এবং কোষ প্রাচীর ভেদ করে বাইরে চলে আসে।	iii. ফাঁপা, দণ্ডাকার, দৃঢ় অঙ্গাবিশেষ যা ব্যাকটেরিয়া দেহের উৎপত্তিগত অঙ্গ।
iv. ব্যাকটেরিয়ার কোষে এদের সংখ্যা অনেক কম থাকে।	iv. এদের সংখ্যা অধিক থাকে।
v. ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।	v. পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
vi. ফ্ল্যাজেলা চলনে সাহায্য করে।	vi. পিলি পোষকদেহে সংযুক্তিতে ও কনজুগেশনে সহায়তা করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

▶ হেপাটিক সাইজোগনি ও স্পোরোগনির মধ্যে পার্থক্য

হেপাটিক সাইজোগনি	স্পোরোগনি
i. হেপাটিক সাইজোগনি মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	i. স্পোরোগনি মশকীর দেহে সংঘটিত হয়।
ii. এ পর্যায়ে মেরোজাইগোট তৈরি হয়।	ii. এ পর্যায়ে জাইগোট তৈরি হয়।
iii. হেপাটিক সাইজোগনি পর্যায়ে মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট, ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট এবং ক্রিপ্টোজয়েট সৃষ্টি হয়।	iii. এ পর্যায়ে স্পোরোজয়েট ও উওসিস্ট সৃষ্টি হয়।
iv. এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস দশায় পরিণত হয়।	iv. এ পর্যায়ে ক্রপের গায়ে সংলগ্ন প্রতিটি উওসিস্টের নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।
v. পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বার বার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পরিণত হয়।	v. উওসিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজমে জমা হয় এবং পরে তার চারদিকে কোষ পর্দা দ্বারা গঠিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হয়।
vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ২-৩ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।	vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ১০-১২ দিন প্রয়োজন হয়।

CamScanner

▶ হেপাটিক সাইজোগনি ও এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মধ্যে পার্থক্য

হেপাটিক সাইজোগনি	এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
i. মানুষের যকৃত কোষে এটি সংঘটিত হয়।	i. এটি মানুষের লোহিত কণিকায় সংঘটিত হয়।
ii. হেপাটিক সাইজোগনিতে হিমোজয়েন উৎপন্ন হয় না।	ii. এর শেষ দিকে হিমোজয়েন উৎপন্ন হয়।
iii. সাফনার-এর দানা দেখা যায় না।	iii. সাইজন্টের বাইরে সাফনার-এর দানা দেখা যায়।
iv. ম্যালেরিয়ার অযৌন চক্রের এ পর্যায়ে রোগীর দেহে জ্বর আসে না।	iv. এ পর্যায়ে রোগীর দেহে কাঁপুনিসহ জ্বর আসে।
v. এ পর্যায়ে ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ দেখতে পাওয়া যায়।	v. এ পর্যায়ে ট্রফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখতে পাওয়া যায়।

▶ ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরোজয়েট ও ট্রফোজয়েট দশার মধ্যে পার্থক্য

স্পোরোজয়েট দশা	ট্রফোজয়েট দশা
i. স্পোরোজয়েট মশকীর লালাতে অবস্থান করে।	i. ট্রফোজয়েট মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থান করে।
ii. এদের দেহের এক প্রান্তে অ্যাপিক্যাল কমপ্লেক্স থাকে।	ii. দেহে কোনো অ্যাপিক্যাল কমপ্লেক্স থাকে না।
iii. স্পোরোজয়েটের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, খাদ্যগহ্বর ও ম্যাট্রিক্স গহ্বর থাকে না।	iii. এদের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, খাদ্যগহ্বর ও ম্যাট্রিক্স গহ্বর থাকে।
iv. সামান্য বাঁকানো কাস্তে আকৃতির অতিক্ষুদ্র পরজীবী।	iv. প্রায় গোলাকার অ্যামিবয়েড ধরনের পরজীবী।
v. দেহ দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক পেলিকল দ্বারা আবৃত।	v. দ্বিস্তরী প্লাজমা দ্বারা এদের দেহ আবৃত।
vi. মশকীর লালার সাথে মানবদেহে প্রবেশ করে যকৃত কোষকে ভক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোকে ধ্বংস করে।	vi. এরা মানবদেহের লোহিত কণিকা ভক্ষণ করে সেগুলোকে ধ্বংস করে।

MENINGES Academic And Admission Care

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাধ্যতামূলক পরজীবী বলা হয় নিচের কোন জীবকে?
ক. ছত্রাক খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. ভাইরাস ঘ. শৈবাল

২. ভাইরাস শব্দের অর্থ কী?
ক. ক্ষুদ্র খ. বিষ
গ. ধ্বংসকারী ঘ. খাদক

৩. ভাইরাসের দেহ কী দিয়ে গঠিত?
ক. নিউক্লিক অ্যাসিড
খ. প্রোটিন
গ. নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন
ঘ. কাইটিন

৪. কোথায় বি...

৫. ভাইরাস এর প্রোটিন নির্মিত আবরণকে কী বলে?
ক. প্লাজমামেমব্রেন খ. কলার
গ. জিনোম ঘ. ক্যাপসিড

৬. অ্যান্টিবায়োটিক কাদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অক্ষম?
ক. ভাইরাস খ. ব্যাকটেরিয়া
গ. ছত্রাক ঘ. শৈবাল

৭.
চিত্রের গঠনটির নাম কী?
ক. T_2-ফায খ. ভ্যাক্সিনিয়া
গ. TMV ঘ. পোলিও

৮. কোন ভাইরাসের আকৃতি পাউরুটির ন্যায়?
খ. পোলিও